সংসার-সমস্যা।

শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ।

প্রকাশক :—

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু,

এক্সচেঞ্জ পাব্‌লিসিং কোম্পানী,—

১৫ নং মাণিকতলা—মে'ন রোড্,

কলিকাতা।

———

সন ১৩২২ সাল।

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস,

মেট্‌কাফ্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌;

৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
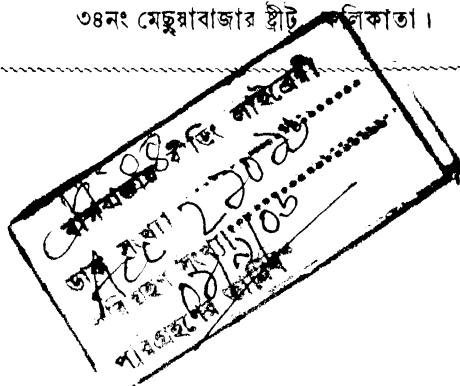
উৎসর্গ

মা, তোরা ঘুমাচ্ছিস্! আর এদিকে যে আমরা একেবারে অবসন্ন হ'য়ে পড়্ছি—উৎসন্নে যাচ্ছি, সে দিকে তোদের একটু খেয়াল নেই! তা'ই এই সংসার-সমস্যা তোদের পায়ে রাখ্ছি; যা' হয় কিছু করিস্ একটা—

তোদের—

যামিনী।

নিবেদন

আমি লেখক বলিয়া বাহাদুরী লইবার আশায় লেখনী ধারণ করিতেছি না, সে দুরাশা আমার নাই। সুতরাং প্রার্থনা করিতেছি, পাঠক-পাঠিকাগণ ভাষার ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া পড়িলে আমি বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ।

———

বিজ্ঞাপন

পাঠকপাঠিকাগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে চৌদ্দ-দিনের মধ্যে একযোগে তিন খানা পুস্তক প্রণয়ন এবং মুদ্রাঙ্কন শেষ করায় ভাষার দিকে বেশী দৃষ্টিপাত করিবার সময় হইল না এবং অনেক ভুলভ্রান্তিও রহিয়া গেল। সুতরাং প্রার্থনা, তাঁহারা ভাষার ত্রুটী এবং তৎসমুদয় মার্জ্জনা করিবেন।

বিনীত—

প্রকাশক।

সংসার সমস্যা।

বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের পক্ষে সংসার করা বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আয়ের অননুকূল অবস্থা এবং ব্যয়ের অত্যধিক বৃদ্ধি তাহাদিগকে বড়ই ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা এক মুহূর্ত্তও একস্থানে শান্ত হইয়া বসিতে পারে না, কেবল হাহাকার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেবল কি করিয়া কোন্ অভাব পূরণ করিবে অনুক্ষণ তাহাই ভাবিয়া বেড়াইতেছে। শান্তি, স্বস্তি এবং সুখ আর তাহাদের কোথায়!

এই বাংলা দেশ এখন আর সেই বাঙ্গালা দেশ নাই। বাঙ্গালা এখন নূতন একটা কিছু হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার হাওয়া, হাব্‌ভাব্, চলন চরিত্র, কার্য্যকলাপ এবং আচার ব্যবহার এখন কেমন এক রকমের হইয়া গিয়াছে। এদেশ এখন কেমন একটা

কি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদেশের এখন আর সে শ্রী নাই, সে বৈভব নাই, এবং সে সৌন্দর্য্য নাই। সে অবস্থা নাই, আর সে ব্যবস্থাও নাই। আছে কেবল নামে মাত্র বাঙ্গালা, কিন্তু বিষয়ে সকলে বিদেশী; আছে দেহমাত্র দেশী, কিন্তু প্রাণ বায়ু পরদেশী; আছে ভাষামাত্র বাঙ্গালা দেশী, কিন্তু ভাব সব ভিন্নদেশী। হায় সেই বাঙ্গালা, সেই সুনীল আকাশ, সেই কাল মেঘ, সেই উজ্জ্বল তড়িৎ-প্রবাহ, সেই জল, সেই হরিৎ শস্যক্ষেত্র, সেই বিনত বেত্রলতা আর সেই বিভিন্ন বিচিত্র পুষ্পরাজি, এ সবই এখনও বিদ্যমান, প্রকৃতি এখনও এখানে পূর্ণাবয়বা। কিন্তু তথাপি যেন এ বাঙ্গালা আর সে বাঙ্গালা নাই, এ দেশ যেন আর সে দেশ নাই। বাঙ্গালীরাও আর যেন বাঙ্গালী নাই। বঙ্গ গৃহ—বাঙ্গালার সংসারও আর শান্তিপ্রদ, সুখের আকর, সোনার সংসার নাই। কেমন কি এক রকম হইয়া পড়িয়াছে। সকল ঘরে, সকল পরিবারে এবং সকল সংসারেই কেমন যেন একটা অভাব অনাটন—কি রকম একটা "নাই নাই, খাই খাই" ভাব সদা সর্ব্বদা বর্ত্তমান। শান্তি যেন একবারে বাঙ্গালাদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। আর তৎপরিবর্ত্তে তৎস্থানে অশান্তি সর্ব্বত্র বিরাজমান। সেই সোনার বাঙ্গালা, সেই সুখের বাঙ্গালা, সেই শান্তির আকর বাঙ্গালাদেশের আজ এমনই দশা! কিসে হইল? কে করিল? কি কারণ? একদিন যেখানে সদাসুখ-শান্তি বিরাজ করিত, একদিন যেখানকার সুশোভিত সুন্দর শ্যামল শান্ত দৃশ্য, শ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি দূর করিত, একদিন যাহার শান্তমূর্ত্তি অশান্তকে সান্ত্বনা দান করিতে সক্ষম হইত, একদিন

যাহার বক্ষে লোক সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিয়া ধন্য হইত, আজ সেই সোনার বাংলার এই শোচনীয় পরিণাম কে করিল? কিসে এই অভাবনীয় অভাবের সৃষ্টি হইল? কিরূপে বঙ্গ-গৃহ, বঙ্গপরিবার এবং বঙ্গ-সংসার অশান্তির আকর হইয়া দাঁড়াইল? কে বঙ্গ গৃহ, বঙ্গ-পরিবার এবং বাঙ্গালার সংসারের শান্তি হরণ করিল?

সেকালে আমরা কি ছিলাম?

বিদেশী এবং অনেক দেশী লোকের মতে তখন "আমরা অশিক্ষিত অসভ্য বর্ব্বর ছিলাম। আমাদের শিক্ষা ছিল না, আমরা অশিক্ষিত অনুন্নত অধম মানুষ ভিন্ন আর কিছুই ছিলাম না। জ্ঞানালোক তখন আমাদের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল না, এবং এ কেবল ইংরেজী শিক্ষা যাহা আমাদিগকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়াছে এবং এতদিনে আমাদিগকে সভ্যতা শিখাইতেছে। আমরা সভ্যতা শিখিতেছি, এবং এতদিনে কেবল অর্দ্ধসভ্য হইয়াছি এবং সম্পূর্ণরূপ সভ্যতা লাভ করিতে হইলে এই দেশ আরও অনেক দিন ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে থাকা দরকার। শিক্ষায় সমুজ্জ্বল হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে ইংরেজ রাজের আইন কানুন মানিয়া চলা নিতান্ত দরকার। ইংরেজ রাজের এদেশে অধিকার বিস্তার করাটা এ দেশের পক্ষে ভগবানের বর ইত্যাদি।"

শেষোক্ত কথাগুলির সমালোচনা এখানে করিব না; কারণ, এইটা তাহার স্থান নয়। এই বিষয় আন্দোলন করিবার সুবিধা

ও সময় এখানে অতি কম। ও সব রাজনীতি-প্রাসঙ্গিক বিষয়, অতএব যখন যেখানে রাজনৈতিক বিষয়ের আন্দোলন করিতে বসিব, তখন সেখানে ও সব কথার আন্দোলন করিব, এ সাংসারিক কথার সময় নয়। তবে প্রথমোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলিবার আছে এবং এখন তাহাই বলিব।

"সে কালে আমরা অশিক্ষিত অসভ্য বর্ব্বর অনুন্নত অধম মানুষ ভিন্ন আর কিছুই ছিলাম না। জ্ঞানালোক তখন আমাদের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল না, এবং এ কেবল ইংরেজী শিক্ষা যাহা আমাদিগকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়াছে ও এতদিনে আমাদিগকে সভ্যতা শিখাইতেছে।" এ কালের তুলনায় হইতে পারে, তখন আমরা অশিক্ষিত অনুন্নত অধম অসভ্য বর্ব্বর ছিলাম। একালের তুলনায় সে-কালে আমাদের তেমন থাকা এমন কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। সে-কালের তুলনায় সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এ ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভের সময় কি না সন্দেহ। কেন না, দেশের অবস্থা সেই সময় এমন দুরবস্থাপন্ন ছিল না। এ সম্বন্ধে অন্য প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন, বিদেশী—এমন কি ইংরেজ ইতিহাস লেখকগণের স্বাক্ষ্যই যথেষ্ট। তখন আমরা কেমন ছিলাম, আমাদের অবস্থা কেমন ছিল, আমাদের সাংসারিক অবস্থা কেমন ছিল, এসব সেই সমুদয় বিদেশী লেখকদিগের লেখনী-প্রসূত গ্রন্থাদি পাঠ করিলেই বেশ জানিতে পারা যায়। অন্য কথায় নিষ্প্রয়োজন।

আমরা কেমন ছিলাম?

আমরা তখন সুস্থ, সতেজ ও বলিষ্ঠ ছিলাম। তখন আমরা প্রশস্ত বক্ষ ও উন্নত অবয়বসম্পন্ন ছিলাম। তখন আমাদের প্রাণে স্ফূর্ত্তি ছিল, বাহুতে বল ছিল, হাতে অস্ত্র ছিল এবং মনে সাহস ছিল; হৃদয়ে তখন আমাদের অদম্য উদ্যম ছিল, অসীম আশা ও উৎসাহ ছিল এবং কলেবরে কাজ করিবার ক্ষমতা ছিল, আমরা কাজ করিতাম। আমাদের দেহ সবল ও সুস্থ ছিল, আমরা প্রাণ ভরিয়া পরিশ্রম করিতে পারিতাম। সামান্য কায়িকক্লেশে আমরা ক্লান্ত বা অধীর হইয়া পড়িতাম না, আমাদের তখন ক্ষমতা ছিল। ক্ষমতা অনুসারে আমরা উন্নতি করিতে পারিতাম। আমাদের সৎসাহস ছিল, আমরা তখন সত্য কথা বলিতে পারিতাম। আমরা তখন সৎকর্ম্ম ও সাধুতা প্রিয় ছিলাম। অন্যায় এবং অসৎ কর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে দণ্ড মাত্র হৃদয় দোদুল্যমান বা বিচলিত হইত না। আমাদের আশা কিংবা আকাঙ্ক্ষা তখন অপরাধীর পুত্রের ন্যায় সঙ্কুচিত ভাবে হৃদয়ে অবস্থান করিত না, অবারিত ভাবে অতি উচ্চে আরোহণ করিতে এবং প্রাণভরা চেষ্টায় পরিপূরণের জন্য প্রয়াস পাইত। আশানুরূপ উদ্যম এবং উপযুক্ততানুযায়ী আমরা অবারিত ভাবে রাজ সরকারে অতি উচ্চপদ লাভ করিতে পারিতাম। জীবনে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে একমাত্র প্রতি-যোগিতা ভিন্ন অন্য কোনও অন্যায় অযৌক্তিক বাধা বিঘ্ন প্রতিবন্ধক রূপে পথের মাঝে দাঁড়াইয়া অসঙ্গত শক্তিপ্রয়োগ দ্বারা পশ্চাতে

রাখিতে পারিত না। এক কথায়, আমরা তখন মানুষ ছিলাম, মানুষের মত অধিকার, আধিপত্য এবং উন্নতিলাভ করিবার সুযোগ এবং সুবিধা ছিল।

আমাদের অবস্থা কেমন ছিল ?

তখন আমাদের ইচ্ছানুযায়ী আশা করিবার অধিকার ছিল, আশানুরূপ উপযুক্ত হইবার উপায় ছিল এবং উপযুক্ততা ও ক্ষমতানুযায়ী উচ্চপদ লাভ করিবার সুবিধা ছিল। সুতরাং তৎকালে আমাদের অবস্থাও ভাল ছিল। এই সোনার বাংলার উর্ব্বরতা তখন আরও বেশী ছিল। কৃষক সামান্যমাত্র পরিশ্রম করিয়া যে শস্য উৎপন্ন করিত, তাহা তাহার পক্ষে অফুরন্ত হইত, সারা বৎসর খাইয়া ফুরাইতে পারিত না। অবশেষে বিক্রয় করিতে হইত। এই সেদিন—আমাদের বাল্যকালে আমরাই টাকায় দশ বার পশুরি করিয়া ধান এবং দেড় টাকা, দুই টাকা এবং আড়াই টাকা মণ হিসাবে চাল বিকাইতে দেখিয়াছি। এ ত মাত্র বিশ বাইশ বৎসরের কথা। এবং তখনই পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর মুখে কথার প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিতেন ' এইত অকাল —এইত অজন্মা আর কি অজন্মা গাছে ধরে ?'' তিনি বলিতেন, তাঁহাদের শৈশবে তাঁহারা দেখিয়াছেন ধান টাকায় চার পাঁচ মণ করিয়া বিক্রয় হইত। শুধু তাই নয়, বিক্রয়কারী, এমন কি, ধান রাখিবার যায়গা পর্য্যন্ত করিয়া দিয়া যাইত। প্রবাদ আছে, লোকে কথায় বলে, কাকে ঠোঁটে করিয়া ধান লইয়া যেখানে ফেলিত, সেখান

হইতে ধান কাটা যাইত। বঙ্গের উর্ব্বরতা এত অধিক ছিল বঙ্গভূমি তখন এত উৎপন্ন করিত!

বঙ্গে তখন খাবার অভাব ছিল না। বঙ্গবাসীর ঘরে খাবার ছিল, প্রত্যেকে পেট ভরিয়া খাইতে পাইত। বঙ্গের প্রতি গৃহে প্রত্যেক দিন 'হা অন্ন, হা অন্ন' রব উঠিত না। প্রতিক্ষণ বঙ্গভবন হাহাকার ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইত না। সদা শান্তি বিরাজ করিত।

বঙ্গের লোক তখন কেবলই কৃষির উপর নির্ভর করিত না; কাজে কাজেই, কৃষি বিভাগ এমন লোকে লোকারণ্য ছিল না। দেশে নানা প্রকার শিল্প বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। নানারূপ ব্যবসায় বাণিজ্য দেশে প্রচলিত ছিল, দেশের বহু লোক এই সমুদয় ব্যবসায় বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকিয়া যথাসম্ভব উপার্জ্জন করিত। দেশী লোক তখন দেশীয় পণ্য দ্রব্য ব্যবহার করিত। অল্প পয়সায় অনেক কাজ হইত। দেশের লোক সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইত। কেবল পয়সা পয়সা করিয়া পরস্পর পরস্পরের পকেট কাটাকাটি কিংবা মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গি করিত না, অথবা এক হাত জায়গার জন্যও আত্ম-কলহের সৃষ্টি করিত না। লোকের ঘরে খাবার থাকাতে—হাঁড়িতে অন্ন থাকাতে অল্প উপার্জ্জনই তাহাদিগকে অনেক সন্তুষ্টি দান করিত। লোকে অল্প পয়সায় সন্তুষ্ট হইত, সামান্য স্বার্থের জন্য অনর্থ ঘটাইত না। আর যেহেতু দেশী লোকের এক কৃষি ভিন্ন রোজগারের আরও অনেক পন্থা ছিল, সুতরাং একখণ্ড ভূমির জন্য জঘন্য প্রবৃত্তির কাজ করিত না; দেশে তখন অনেক জমি

পতিত পড়িয়া থাকিত। কেহ আবাদ করিত না, পত্তন লইত না। জমির তখন এত আদর ছিল না। জমি কেহ পুছিত না। কারণ, তখন দেশী লোকের ভূমি কর্ষণ ছাড়া জীবিকা অর্জ্জনের আরও উপায় ছিল। আর যেহেতু সেই সমুদয় শিল্প বাণিজ্য এবং ব্যবসায়ে লোকে নগদ পয়সার মুখ দেখিতে পারিত, সুতরাং লোকে তখন সেই সমুদয়েই বেশী মাতিত এবং সেই সব দিকেই বেশী যাইত। কাজে কাজেই কৃষির উপর বেশী ঝুঁকি ছিল না।

পয়সা দেশে কেমন ছিল?

বলা বাহুল্য, পয়সা তখন বড় দুষ্প্রাপ্য বস্তু ছিল। জিনিস জন্মিত যথেষ্ট, কোনও পণ্যের জন্য এ দেশকে পরদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না। এদেশে যাহা জন্মাইত তাহাই এদেশের লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইত। কিন্তু পয়সা তখন দেশে বড় কম ছিল। প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমুদয় সহজে পাওয়া যাইত, কিন্তু পয়সা পাইতে বড় বেগ পাইতে হইত। পয়সা সহজে মিলিত না। পয়সা ছিল বড় দুষ্প্রাপ্য। কারণ, পয়সার আমদানী হয় স্বদেশজাত পণ্যের বিদেশে রপ্তানী করাতে। স্বদেশজাত পণ্যের বিদেশে রপ্তানী যত বাড়িবে, দেশে পয়সার আমদানী তত অধিক হইবে। আর যত কম হইবে, তদনুপাতে পয়সার আমদানীও কম হইবে। সুতরাং পয়সার আমদানীর হ্রাস বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। এদেশ জাত পণ্য দ্রব্য তখন এই দেশের মধ্যেই অনেক কাটতি হইয়া যাইত। আর যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহাও আজ কালের ন্যায়, তখন আমদানী

রপ্তানী করার সুবিধা না থাকায় আমদানী রপ্তানীর কর্ম্ম তেমন সুচারু রূপে সুসম্পন্ন হইতে পারিত না। কাজে কাজেই পয়সার আমদানী দেশে তত অধিক হইতে পারিত না। তাই দেশে তখন পয়সা এত সহজে মিলিতে পারিত না।

কিন্তু পয়সার দুষ্প্রাপ্যতায় দেশে তখন এমন হাহাকার রব উঠিত না। দেশের লোক তখন পয়সার উপর নির্ভর করিত না, স্বদেশ জাত পদার্থের উপর নির্ভর করিত। ক্ষেত্রে অফুরন্ত শস্য জন্মিত, ধান, চাল, দাইল, কলাই, গম, যব, সরিষা, তিল, প্রভৃতি নানা রূপ শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিত। খাদ্যসামগ্রীর জন্য কাহাকেও কাহারও দুয়ারে যাইতে হইত না। তার পর তৎকালে এদেশে প্রায় সর্ব্বত্রই কার্পাসের আবাদ ছিল, এমন কি অনেক স্থানে প্রায় প্রতি পল্লীতে, প্রতি গৃহে কার্পাসের আবাদ ছিল। লোকে তাহা হইতে তুলা সংগ্রহ করিত এবং আপন হাতে আপনার গৃহে বসিয়া সূতা কাটিত এবং তদ্দ্বারা শেষে ইচ্ছামত কাপড় প্রস্তুত করিয়া পরিত। এক কথায়, প্রায় প্রত্যেকেরই ডোলে চাল, দোয়াইরে মাছ, এবং চরকায় সূতা ছিল।

পয়সার প্রয়োজন, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য। তদ্ব্যতীত শুধু পয়সা কেহ চিবাইয়া খাইতে পারে না, অথবা ইচ্ছানুরূপ পরিতেও পারে না; পয়সা দ্বারা লোকে হয় খাদ্য সামগ্রী, না হয়, কোনও পরিধানের উপযোগী পদার্থ প্রয়োজন মত খরিদ করিয়া থাকে। এই ত পয়সার মূল্য বা প্রয়োজন। কিন্তু পয়সার পরিবর্ত্তে সদা সর্ব্বদা আমরা যে সব প্রয়োজনীয় জিনিস পাইব, তাহা যদি

সর্ব্বদা আমার ভাঁড়ারে মজুত থাকে, অথবা যদি আমি অন্য কিছুর পরিবর্ত্তে পাইতে পারি, তবে পয়সায় আমার কি দরকার? যদি নিত্য প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি নিরন্তর যে কোনও প্রকারে আমার আয়ত্তাধীন হয়, তবে পয়সায় আমার কি প্রয়োজন? কিরূপে পয়সা আমার আর তেমন প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিবে? আর ইহার অভাবেই বা আমার এমন কি অসুবিধা হইতে পারে? কিছু না। এ দেশবাসীরও অবস্থা তখন সেইরূপ ছিল। প্রয়োজনীয় পদার্থ সমুদয় প্রায় সকলেরই আয়ত্তাধীন ছিল; কাজে কাজেই দেশে পয়সা দুষ্প্রাপ্য হইলেও দেশী লোকের তাহাতে বিশেষ কোন অসুবিধা ছিল না। তাহাদের মনে সর্ব্বদা শান্তি বিরাজ করিত, দেশে পয়সার অভাব থাকিলেও দেশী লোকের প্রাণে শান্তি ছিল, তাহারা তখনও শান্ত মনে কাঁধে গামছা ফেলিয়া প্রশস্ত বক্ষ প্রসারণ করিয়া বাতাসে মাথা রাখিয়া বাবরী খুলিয়া বৈকালবেলায় বনের ধারে, কিংবা বড় হাটে বেড়াইতে বাহির হইত। প্রাণ খুলিয়া দুইটা প্রাণের কথা বলিবার অবসর পাইত, দুই একটা মনমাতান গান গাহিয়া প্রাণ জুড়াইত। দেশে পয়সার অভাব হইলেও তখন প্রীতির অভাব ছিল না, অথবা শান্তির অভাব ছিল না। এদেশে তখন শান্তিদেবীর প্রশান্ত মূর্ত্তি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান থাকিত।

আমাদের সাংসারিক অবস্থা কেমন ছিল ?

আমাদের সংসার তখন কেমন ছিল ?

অভাবই সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া থাকে। অভাবে পড়িলে লোক অধীর হয় ও মনের চঞ্চলতা হেতু অনেক বিষয়ে ভুল করিয়া বসে এবং তাহার ফলে নানারূপ অশান্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু বাংলায় তখন বড় একটা কিছুর অভাব ছিল না, ডোলে ধান, দোয়াইরে মাছ এবং চরকায় সূতা, প্রায় প্রত্যেক বঙ্গবাসীর এ সংস্থান ছিল বা থাকিত। সুতরাং আমাদের সংসারে অশান্তির তেমন কোনও কারণ ছিল না। স্ত্রী পুরুষ সকলেই সুস্থ, সবল ও পরিশ্রমী ছিল; সকলেই দিন ভরিয়া পরিশ্রম করিত এবং রা'ত ভরিয়া নিদ্রা যাইত। কোনও অশান্তি বা অকারণ কলহ হঠাৎ বাঁধিয়া উঠিবার প্রায় তেমন কোনও কারণ থাকিত না, হইতও না। এই হইল সাধারণ লোকদিগের কথা। ইহার পর মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের কথা বলিব। মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকদের প্রায় সকলেরই কিছু না কিছু জোত জমা এবং তালুক মুলুক থাকিত। তাহারা নিজ বাহুবলে সেই সমুদয় শাসন সংরক্ষণ করিত। তাহাদের শরীরে তখন যথেষ্ট শক্তি ও সাহস ছিল। তাহারা লোক রাখিয়া জোতের জমি আবাদ করাইয়া ধান্য ও রবি শস্যাদি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ উৎপন্ন করিত। এই উৎপন্ন শস্য লোকজন সমভিব্যাহারে তাহাদের বৎসরের ব্যয়, বার মাসের তের পর্ব্ব, নানা প্রকার দেব দেবীর পূজা, নানারূপ ব্রত বিধান ও শান্তি স্বস্ত্যয়ন এবং অতিথিশালায়

অতিথিসৎকারের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। তাঁহারা ইহার সাহায্যে দুর্ব্বল নিঃস্ব গ্রামবাসী প্রতিবেশী ও পাড়া-পড়শীদিগকে নানারূপে সাহায্য করিতেন। ইহার উপর তাঁহারা তাঁহাদের লেখনীকে নিশ্চেষ্ট রাখিতেন না; তাহার সহায়ে তাঁহারা আর কিছু রোজগার করিতেন। ইহার দ্বারা তাঁহাদের প্রাধান্য আরও বৃদ্ধি পাইত এবং তাহার সাহায্যে তাঁহারা ভদ্রোপযোগী মান সম্ভ্রম যাহা কিছু সব বজায় রাখিয়া চলিতেন।

এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের আরও একটী রোজগারের পথ ছিল এবং তাহাও নিতান্ত কম আয়ের অঙ্ক ছিল না। এই সমুদয় পরিবারের স্ত্রীলোকেরা একবারে বসিয়া খাইতেন না। তাঁহারাও আল্‌সে অকেজো ছিলেন না; তাঁহারাও কাজ করিয়া খাইতেন, বেকার বসিয়া খাইতেন না। পুরুষেরা যেমন বাহিরে বিভিন্ন প্রকার কাজে নিযুক্ত হইয়া নানা প্রকারে অর্থ উপার্জ্জনের পথ দেখিতেন, বাড়ীর ভিতরে স্ত্রীলোকেরাও সেইরূপ দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জিত অর্থের সঞ্চয় ও সদ্‌ব্যবহার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। যাহাতে অর্থের অপব্যয় সংসাধিত হইতে না পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন।

তৎকালে বাঙ্গালার ভদ্রঘরের মেয়েরা কেবলমাত্র মাংস-পিণ্ড তুল্য ছিলেন না। তাঁহারাও সুস্থ, সবল ও পরিশ্রমী ছিলেন। পুরুষেরা যেমন প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজিত করত তাহার বক্ষস্থিত রত্নরাজি হরণ করিয়া লইয়া আসিতেন, বাড়ীর ভিতরে স্ত্রীলোকেরাও তেমনই আবার অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই

সমুদয় ধন রত্ন বিনাব্যয়ে বা অতি অল্প ব্যয়ে সুন্দর ভাবে গুছাইয়া ঘরে উঠাইতেন ও সুন্দররূপে সুসজ্জিত করিয়া যাহাতে কোন সামান্য একটি জিনিসও নষ্ট না হইতে পারে সেরূপ ভাবে রাখিতেন। এই জন্য তাঁহাদিগকে দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে হইত। এই এত বড় বড় সংসারেও তাঁহাদিগকে ধানঝাড়া ধান শুকান হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত গৃহকার্য্য আপন হাতে সম্পন্ন করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত অতিথি অভ্যাগত এবং আত্মীয় স্বজনের আদর অভ্যর্থনাদি করিতে হইত। তাঁহারা এই সমুদয় কাজ করিতে কোনও রূপ আপত্তি বা বিরক্তি বোধ করিতেন না, বরং স্ফূর্ত্তির সহিত তাঁহারা এই সমুদয় কাজ ও তজ্জন্য এই পরিশ্রম করিতেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহারা কোনরূপ ক্লান্তি বোধ করিতেন না। তাঁহারা কাজ করিয়া আমোদ পাইতেন। স্বহস্তে রান্নাবান্না করিয়া পতি পুত্র এবং আর আর সমুদয় পরিজনবর্গকে স্বয়ং পরিবেশন করিয়া ভোজন করাইতে তাঁহারা পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। ইহা তাঁহারা একটা কার্য্যের মধ্যে গণনা করিতেন না, তাঁহারা সাংসারিক কাজের এইটুকুকে সৌভাগ্যের সুখভোগ করা মনে করিতেন। অনেক সময় বলিতেন "এমন ভাগ্য কয় জনের হইয়া থাকে? দশ জনের পাতে প্রত্যেক দিন চারিটী কিছু পরিবেশন করিবার সুখ কয়জনে ভোগ করিবার সুযোগ বা সুবিধা পাইয়া থাকি? কাহার ভাগ্যে আছে, কেইবা করিতে পারে?" ইত্যাদি। প্রত্যেক দিন কেবলমাত্র পরিজনবর্গের পাতে চারিটী কিছু পরিবেশন করিয়াও পরিবেশনের বাসনা পরিপূর্ণ হইত না,

সুতরাং মাসে মাসে অন্য কোনও একটা কিছুর অনুষ্ঠান করিতেন এবং তদুপলক্ষে প্রতিবেশী দুই চারি জনকে ডাকিয়া ভোজন করাইতেন।

স্বামি-সেবা—পতি-পূজা তাঁহাদের সাংসারিক কাজ কর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ছিল। কারণ, সংসারে স্বামী ভিন্ন তাঁহারা অন্য কোনও উপাস্য দেবতা জানিতেন না। স্বামীই একমাত্র দেবতা—একমাত্র পূজ্য বস্তু, উপাস্য বা পার্থিব সামগ্রী। কেননা, শৈশব হইতে হিন্দু শাস্ত্র আর কোনও দেবতার নাম তাঁহাদিগকে শিখায় নাই। সুতরাং বিবাহান্তে স্বামীকেই একমাত্র আরাধ্য বা উপাস্য দেবতা জানিয়া আসিয়াছেন। স্বামীই তাঁহাদিগকে মুক্তি দানে সমর্থ, স্বামী হইতেই তাঁহারা মুক্তিপদ লাভ করিতে সক্ষম, হিন্দু-শাস্ত্র তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বুঝাইয়াছিলেন হিন্দুশাস্ত্রের এত গোলমালের পর একমাত্র ঈশ্বরকে জানা বা উপলব্ধি করা অল্প বুদ্ধি অবলা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বড় কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে সুতরাং সহজে যাহাতে একমাত্র ঈশ্বরই সব এই কথা বুঝাইয়া এবং সহজে একমাত্র ঈশ্বরকে স্বামীরূপে পাইবার জন্য একমাত্র স্বামীকেই সর্ব্বদেবতা-ময় বুঝাইয়া দিয়াছে। তাই হিন্দু-স্ত্রীলোকেরা স্বামীই একমাত্র উপাস্য বা আরাধ্য দেবতা জানিয়াছে এবং আজ এই দুর্দ্দিনেও অনেক স্থলে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং সেরূপ স্ত্রী এখনও এই ভারতে দুষ্প্রাপ্য নয়, আজও এ বঙ্গে সে রকম স্ত্রী আছে। সধবা স্ত্রীলোকেরা তখন স্বামীর পাদোদক পান না করিয়া

জল গ্রহণ পর্য্যন্ত করিতেন না। স্বামী যদি দূরদেশে অবস্থিত থাকিতেন তবে উদ্দেশ্যে তাঁহার আরাধনা করিয়া তবে অন্য কাজে মনোনিবেশ করিতেন। কোনও কিছুতে স্বামীর অসন্তুষ্টির কারণ হইলে তাঁহারা প্রমাদ গণিতেন, কত বিপদ্ পাতের আশঙ্কা করিতেন। সুতরাং সদা সর্ব্বদা স্বামীর সন্তুষ্টি সাধন করাই সংসারে সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বলিয়া জানিতেন অতএব প্রাণপণে তাহাই করিতেন। স্বামীই তাঁহাদের ইহ কালের সুখ শান্তির আধার এবং পরকালেও পরম গতির কারণ। একমাত্র স্বামীতেই সর্ব্বসুখ নিহিত থাকিত। স্বামীই তাঁহাদের ইহপরকালের সুখের মূল।

স্বামী-সেবাই এদেশী স্ত্রীলোকদের এক মাত্র সুখের মূল ছিল। অতএব তাঁহারা প্রাণপণে তাহাই করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা যে আর কাহাকেও যত্ন বা আর কাহারও পরিচর্য্যা করিতেন না, এরূপ নহে; বরং স্বামীর প্রীত্যর্থে তাঁহারা পরিবারভুক্ত অন্যান্য সকলের পরিচর্য্যা করিতেন এবং ইহাতে পতি-প্রাণা পতি-সোহাগিনী সতী ললনারা অতিশয় সুখী হইতেন। তাঁহারা সংসারে বিরাজমানা শুভপ্রদা গৃহলক্ষ্মী বলিয়া কথিত হইতেন। সংসারের সকলে তাঁহাদিগকে ভালবাসিত, ভয় করিত ও মানিয়া চলিত। তাঁহারা সংসারে সাক্ষাৎ শক্তি-রূপা সতী বলিয়া সম্মানিতা হইতেন।

গৃহকার্য্যে এদেশী ললনাগণ অতিশয় তৎপর ছিলেন। তাঁহারা অতি প্রত্যুষে স্বামীর পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহশুদ্ধি করণান্তর প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তে সংসারের কাজে মন দিতেন এবং মনপ্রাণে তাহা সমাপন করিতেন। তাঁহাদের চোকের সম্মুখে

সামান্য তৃণগাছও নষ্ট হইতে পারিত না। তাঁহাদের জানিত অবস্থায় কোন জিনিসেরই অপচয় হইতে পারিত না। তাঁহারা অতিযত্নে সমস্ত জিনিসের সংরক্ষণকার্য্য সমাধা করিতেন। তাঁহারা দাঁতে তৃণ লইয়া প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া সংসার গঠন করিতে প্রয়াস পাইতেন। স্নানাহার পর্য্যন্ত এইরূপ কঠিন পরিশ্রম করার পর আহারান্তে যে সামান্য মাত্র সময় বিশ্রাম করিতেন তাহাও তাঁহারা বৃথা নষ্ট করিতেন না; রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া বা শ্রবণ করিয়া যথাসম্ভব ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতেন। পরের কুৎসা গান বা কুকথা আলাপনে বৃথা কাল কাটাইতেন না। সংসারে কোন কথাটীও হইত না। তাই এ সংসার সোনার সংসার, সুখের সংসার ইত্যাদি কতরূপে কথিত হইত।

তৎকালে এ দেশ স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্মাদি সমাপনান্তে সামান্য রূপ পয়সা রোজগার করিবারও সময় পাইতেন। তখন প্রায় প্রতি গৃহেই একটী করিয়া চরকা থাকিত। গৃহিণীরা তৎসাহায্যে কার্পাস তূলা হইতে সূতা প্রস্তুত করিতেন এবং তদ্দ্বারা পরিধান-উপযোগী কাপড় অথবা গামছা কিংবা মশারি প্রস্তুত হইত। এবং সেই সমুদয় জিনিষ বিক্রয়ার্থ বাজারে লইয়া যাইতে হইত না, লোকে বাড়ী হইতেই উচিত মূল্য দিয়া কিনিয়া লইত। ইহাতে বেশ দুপয়সা লাভ হইত। অতএব প্রায় প্রত্যেক গৃহিণীরা এই কাজ করিতেন এবং তাহাতে বাড়ীর কন্যা এবং বধূরা তাহাদিগকে সাহায্য করিত এবং তজ্জন্য তাহারা দুই চারি পয়সা জলপানি পাইত ও কোনও

পর্ব্ব উপলক্ষে ইহার সর্ব্ববহার করিত। বাসগৃহ, বাস্তবিকই তখন বড় সুখের স্থান ছিল। হায়! সেই রাম আর সেই অযোধ্যা!

মোটামুটি।

এক কথায় বলিতে গেলে তখন আমরা সুস্থ ও সবল ছিলাম। আমাদের বাহুতে বল ছিল, শরীরে তেজ ছিল, মনে সাহস ছিল; আমরা মানুষ ছিলাম, আমাদের মনুষ্যত্ব ছিল, মনুষ্য উপযোগী ক্ষমতা এবং অধিকার ছিল। আমরা তখন মানুষের ন্যায় আশা করিতে পারিতাম এবং উচ্চ পদ লাভ করিতে অধিকারী ছিলাম। আমাদের উন্নতির পথে বাধা দিবার তখন কেহ ছিল না। আমাদের ক্ষমতা এবং উপযুক্ততা অনুযায়ী আমরা তখন উন্নতি ও উচ্চপদ লাভ করিতে সক্ষম হইতাম।

আমাদের অবস্থা তখন মোটের উপর বেশ ভাল ছিল। দেশে কৃষির অবস্থা অতি সুন্দর ছিল, দেশী লোকের খাদ্য দ্রব্যের অভাব ছিল না। সকলের ঘরেই খাবার থাকিত, সকলেই অন্ততঃ দুই বেলা খাইয়া বাঁচিত। দেশে কোথায়ও এমন সারা বৎসর ভরিয়া 'হা অন্ন, হা অন্ন' রব উঠিয়া থাকিত না। দেশে প্রচুর পরিমাণে ধান ও অন্যান্য অনেক রকম রবি শস্য জন্মিত।

এতদ্ব্যতীত দেশে তখন নানা প্রকার শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। এ সকল উপায়ে লোকে যাহা কিছু রোজ-গার করিত, তদ্দ্বারাই তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিত।

দেশে তখন সর্ব্বদা শান্তি বিরাজ করিত। সর্ব্বক্ষণ দেশের সর্ব্বত্রে এমন সর্ব্বনেশে হাহাকার রব সমুত্থিত থাকিত না।

তারপর, বঙ্গসংসার তখন প্রকৃতপক্ষেই শান্তিনিকেতন ছিল। স্বামী স্ত্রী সমানভাবে পরিশ্রম করিয়া সংসারখানি গড়িয়া তুলিতেন। পুরুষেরা যেমন পরিশ্রম করিয়া প্রকৃতি বিজয় পূর্ব্বক ধন রত্ন বাড়ীতে লইয়া আসিতেন, স্ত্রীলোকেরাও তখন তেমনই কষ্ট সহ্য করিয়া সে সমুদয় সুন্দররূপে গুছাইয়া, ঘরে তুলিয়া বেশ করিয়া সাজাইয়া রাখিতেন। সংসারে সকলকে পরিতৃপ্ত ও পরিতুষ্ট রাখিতেন এক পরিবারভুক্ত পরিজনবর্গের ভিতর প্রায়ই তেমন কোনও বৃথা কলহের সৃষ্টি হইত না। বঙ্গের প্রত্যেক খানি সংসার তখন যথার্থই সোণার ছিল, বাঙ্গালার প্রত্যেকটী সংসার এক একটী সুখকেন্দ্র বলিয়া অনুমিত হইত, বাঙ্গালার প্রত্যেক সংসার শান্তি দেবীর বাঞ্ছিত বসতভূমি বলিয়া মনে হইত। বঙ্গ-ললনাগণ তখন বঙ্গলক্ষ্মী বা গৃহলক্ষ্মী বলিয়া কথিত হইত।

তখন এ বাঙ্গালা দেশ বাস্তবিক এমনই ছিল! বঙ্গভূমি তখন এমনি সুখের আকর ভূমি ছিল, কিন্তু হায় কর্ম্ম, আর হায়রে কাল!

আর এখন ?

এখন সভ্য হইয়াছি, শিক্ষা পাইয়াছি, এবং জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছি। এখন আমরা শিক্ষিত ও উন্নত ; এখন আমরা সভ্য। এইরূপই লোকে বলিয়া থাকে,

আমরাও সেই কথা মানিয়া থাকি! আমাদের দেশ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত, ইহা লোকে চোকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয়। আমরাও তখন ঢোক্ গিলিয়া ঢাকে তাল না দিয়া থাকিতে পারি না; সুতরাং তখন অবশ্য বলিয়া অব্যাহিত পাই। তাই ত—

দেশের এমন অবস্থা কোন দিন ছিল?

ইতি পূর্ব্বে কখন এদেশে রেল ষ্টিমার ছিল? কোন্ কালে* এদেশী লোক রেল ষ্টিমারে যাতায়াত করিবার সুযোগ বা সুবিধা পাইয়াছিল? কোন্ সময়ে এদেশী ব্যবসায়ীরা রেল ষ্টিমারে করিয়া দেশ বিদেশে যথা তথা পণ্য দ্রব্য আমদানী রপ্তানী করিতে পারিত? কখন কোন্ কালে এদেশী লোক পরিষ্কার কলের জল পান করিত? কোন্ দিন এদেশবাসীরা ড্রেন পায়খানায় মল মূত্র ত্যাগ করিতে পারিত? কোন্ কালে, এদেশী লোক সাইকেল এবং মটর গাড়ীতে আরোহণ করিয়া প্রিয়া সহযোগে গড়েরমাঠে হাওয়া খাইবার অবসর পাইয়া ছিল? কোন্ কালে তোমরা ট্রাম গাড়ীতে চড়িয়া ছিলে এবং বিদ্যুতালোকে বসিয়া বিদ্যুৎ-চালিত পাখার বাতাস খাইয়াছিলে? এসব সেকালে তখন তোমাদের কিছু ছিল কি? এসব তখন এদেশে ছিল না, এখন হইয়াছে। অতএব দেখ, তখনকার তুলনায় এদেশ কি এখন অনেক উন্নত নয়? অবশ্য; কিন্তু কি দাম দিয়া কি জিনিস কিনিয়াছি? আমরা তখন ছিলাম কি? আর হ'লেম কি? আমাদের ছিল কি এবং এখন আমাদের আছে কি? তখন আমাদের সংসার খানা কি সুখের

স্থান ছিল ? আর এখন ইহা কেমন সুখের আকরে পরিণত হইয়াছে ? একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ দেখি, একবার আসল খাতা খানা খতাইয়া ভালরূপে তলাইয়া দেখ দেখি ?

এখন আমরা কি আছি এবং কেমন ?

এখন আমরা শিক্ষিত সভ্য মানুষ! আমরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া জ্ঞান-আলোকে আলোকিত হইয়াছি; সুসভ্য দেশের আধুনিক সভ্যতা আস্তে আস্তে আমাদের বাহির হইতে আরম্ভ করিয়া অভ্যন্তর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছে; অতএব এখন আমরা সভ্য হইয়াছি। তখন আমরা অসভ্য বর্ব্বর মাত্র ছিলাম আর এখন আমরা শিক্ষা ও সভ্যতা লাভ করিয়া মানুষ হইয়াছি। কথাটা কতক পরিমাণে যে ঠিক তাহা আর অস্বীকার করিবার যো নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা এখন প্রকৃত প্রস্তাবে এখন সারশূন্য ভেরেণ্ডায় পরিণত হইয়াছি। এ শিক্ষায় আমাদের মনুষ্যত্ব ক্ষয় করিয়া আমাদের মাথা খাইয়াছে, এই জ্ঞানালোক আমাদিগকে অতি উত্তম অন্ধ বানাইয়াছে। আর এ সভ্যতা, সত্য কথা বলিতে কি আমাদের সোনার সংসার পোড়াইয়া একবারে ছার খার করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা বাস্তবিকই এখন সার শূন্য ভেরেণ্ডা হইয়া দাঁড়াইয়াছি। আমাদের এখন মনে স্ফূর্ত্তি নাই, প্রাণে বল নাই, বাহুমূলে আর এখন আমাদের বিজয়তড়িৎ প্রবাহিত হয় না। এখন আর আমাদের সৎ প্রবৃত্তি নাই, মনে সৎ সাহস নাই, আমরা এখন সত্য

কথা বলিতে সক্ষম নই, এখন আমাদের [illegible] কিংবা অন্যায়ের প্রতি-কূলে দাঁড়াইবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। আমরা এখন মনুষ্যত্ব শূন্য মানুষ, ধনবিহীন ধনী, এবং আধিপত্য শূন্য অধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছি। আমরা সবই হইয়াছি কিন্তু কিছুই না; আমাদের সবই আছে কিন্তু কিছুই নাই; আমাদের সব অধিকারই আছে কিন্তু আধিপত্য পাই না। এই প্রকৃত প্রস্তাবে আজ আমরা যাহা, ঠিক তাহা। কিন্তু ইহাতে আমাদের কোন শোক কিংবা দুঃখ নাই, আপত্তি কি অনুযোগের কারণ নাই, অথবা বৃথা আপত্তি অনুযোগ করিতে চাই না, ইহাতে কোন লাভ নাই। সুতরাং সেসব কথা বলি না, বলিতে চাই না। কিন্তু বিদেশাগত নূতন সভ্যতা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যে প্রলয় উপস্থিত করিয়াছে ইহা নিবারণ করিবার কি পন্থা? এ দুঃখ যে আর সয় না। এ যে অসহনীয় অন্তর্দ্দাহ, আমাদের অবস্থায় যে আর ইহার ব্যবস্থা হইতে পারে না। আমাদের আয় যে ব্যয় সঙ্কুলনে অসমর্থ! আমাদের ক্ষমতায় এখন যে তার মানে। আমাদের যে শক্তি সে শক্তিতে এখন আর এ সভ্যতার টান কুলায় না! এখন যে আমরা নিঃস্ব, দুর্ব্বল ও দুরাবস্থাপন্ন!

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা।

দেশে এখন যাহাই জন্মা'ক, দেশে যতই কেন উৎপন্ন হউক না, বাঙ্গালায় এখন দুবেলা নিশ্চিন্তে বসিয়া খাওয়া দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তেমন বড় গৃহস্থের ঘরেও বৎসরের খরচের ধান মজুত দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষ সুবিধা না থাকিলে

বাঙ্গালার এখন নিশ্চিন্ত ভাবে দুই বেলা বসে খাওয়া আজ কাল একটা বাস্তবিকই বিষম ব্যাপার! কেবল মাত্র কয়েক জন প্রকৃতির প্রিয়পুত্র ব্যতীত অনেকেরই ঘরে খাবার মজুত থাকিতে পারে না, "যত্র আয় তত্র ব্যয়" স্থিতির অভাব প্রায় সর্ব্বত্রই পরিদৃশ্যমান।

সুখের বিষয় বর্ত্তমানে এদেশে পরিশ্রমীদের দৈনিক আয় একটু বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? এখন খাদ্য-সামগ্রীর দর এত বাড়িয়া গিয়াছে যে তাহারা খোরাকী বাসাভাড়া অসুখ, অনুপস্থিত বাদে বড় কিছু রাখিতে পারে না। সেকালে তখন অল্প উপার্জ্জনে যেরূপ সুখ শান্তিতে কাল যাপন করিতে পারিত, এখন এই বেশী উপার্জ্জন করিয়া তাহা পারে না। সুতরাং উপার্জ্জনের উন্নতি হইলেও আজ পর্য্যন্ত তাহারা উন্নত হইতে পারে নাই, তাহাদের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে, তাহারা যেমন, ঠিক তেমনই রহিয়াছে। তবে লাভ এই, তাহারা কতকটা পয়সা বেশী পায় এবং দোকানে দিবার সময় কিছু বেশী দেয়, কিন্তু জিনিস যাহা ঠিক তাহাই পায়। লাভ তাহাদের বহন করা মাত্র। পরিশ্রমীগণ পায় বেশী, দেয়ও বেশী; অবশিষ্ট অতি অল্প মাত্র। আর, লাভ? বহন করা। সুতরাং তাহারা তখনকার চেয়ে এখন যে অতিশয় সুখী একথা বলা যায় না। তখনই ভাল ছিল, কেননা যদিও আজ কাল মজুরী বেশী পায় তথাপি এখন একদিন কাজ না করিলেই আর মুখে কথাটী থাকে না। কিন্তু তখন যদিও মজুরী কম পাইত, তথাপি দুই

একদিন কাজ না করিলেও মজুরদের এমনধারা মুখ শুকাইত না। গ্রামের প্রতিবাসী ভদ্রলোক বাড়ীতে গেলে, তাহারা আবক্ত বদনে অকুণ্ঠিত চিত্তে দুই একদিন চলিবার মত চা'ল দাল, লবণ-মরিচ, তৈল প্রভৃতি দান করিত। সুতরাং মজুরদের তখন মুখ শুকাইবার কিছু ছিল না। তাহাদেরও মনে তখন শান্তি ছিল। তাহারাও তখন সুখে ছিল। তখন মজুরের মনেও সুখ ছিল। আর এখন এদেশের ভদ্র লোকেরাও বড়াই করিয়া সুখ শান্তির গৌরব করিতে অক্ষম। কি পরিবর্ত্তনই বটে!

সাধারণ ভদ্রলোকদিগের সমস্যা।

ভদ্রলোকেরা আজ কাল বড় বিপদ্গ্রস্ত। তাহাদের "আয়ের ঘরে ছোট আলু কিন্তু ব্যয়ের ঘরে বড় গাছ।" আয় অতি অল্প কিন্তু ব্যয় দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। এবং ফলে ঋণগ্রস্ত হইয়া প্রতিদিন তাহারা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পাড়িতেছে। পূর্ব্বের সে কৃষি এখন আর তাহাদের পক্ষে লাভের দিকে দাঁড়ায় না। কৃষি বিভাগের উপর এখন বোঝা বেজায় ভারী হইয়া পড়িয়াছে; কারণ, তখন যাহারা শিল্প বাণিজ্য বিভাগে ব্যস্ত থাকিত, আজ কাল দেশে শিল্প বাণিজ্যের অভাব হওয়াতে সে সমুদয় লোক ঐ একমাত্র কৃষির উপরই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; কাজে কাজেই কৃষির বোঝা ভারী হইয়া পড়িয়াছে। কেবল ইহাতে আর কুলায় কোথায়! কথায় বলে—

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি,
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি,

ঘরে ব'সে খাটায় যে,
ক্ষতির ভাগ লয় সে।

ভদ্রলোকেরা নিজ হাতে চাষ আবাদের কাজ করতে পারে না, তাহাদিগকে লোক রাখিয়া কাজ করাইতে হয়; কিন্তু কৃষি কার্য্য করিতে খরচ আজ কা'ল এত অধিক পড়ে যে তাহা আর তাহাদের পক্ষে কোনরূপেই লাভজনক হয় না। "কাঁধে ছাতায় আর কুলায় না।" সুতরাং তাহাদের পক্ষে বর্ত্তমানে এই ব্যবসায় কেবল শেষোক্ত ফলই দাঁড়াইয়া থাকে। অতএব এখন, আজ কা'ল ভদ্রলোকেরা এই ব্যবসা একরূপ পরিত্যাগ করিয়াছে। এবং লেখনীই একমাত্র জীবিকাঅর্জ্জনের অবলম্বনস্থল হইয়া পড়িয়াছে। কেরাণীগিরি ব্যতীত বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের আর অন্য উপায় নাই। চাকরীই তাহাদের চরম গতি, ইহা তাহারা আজ অনেক দিন হয় বুঝিতে বাধ্য হইয়াছে।

ভদ্রলোকেরা আগে মনে করিতেন তাঁহাদের কলম আর কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না, ইহা তাঁহাদের নিজস্ব এবং এক চেটিয়া মহল। এখানে আর কেহ অধিকার পাইবে না। কিন্তু তাঁহাদের সেই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল, তাঁহারা এখন তাহা বেশ ভালরূপে উপলব্ধি করিতেছেন।

এক সময়ে চাকরী একরূপ মন্দ ছিল না। মানে কৃষিকার্য্যে যেরূপ লাভ হইয়া থাকে রাজসেবা অর্থাৎ চাকরীতে তাহার অর্দ্ধেক লাভ হইত। অর্থাৎ কোনরূপে কাপড়েচোপড়ে ভদ্রতা বজায় রাখিয়া চলা যাইত। তাই ভদ্রলোকেরা সব ছাড়িয়া একমাত্র

লেখনী আটিয়া ধরিয়া চাকুরী ব্যবসায়ী হইলেন। এখন ভদ্রলোকদের ব্যবসা চাকরী। কিন্তু পোড়া কপালে তাহাতেও সুখ হইল না। এ আমলে সকলেই সমভাবে শিক্ষায় অধিকারী। এখন এ বিষয়ে আর ইতর বিশেষ নাই। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় বৎসর বৎসর সকল প্রকার জাতীয় ভূরি ভূরি ছাত্র পাশ করাইতে লাগিল, ফলে চাকরীর দর একবারে কমিয়া গেল। পূর্ব্বে যেখানে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া পঞ্চাশ টাকা মাসে রোজগার করিত, এখন বি, এ, পাশ করিয়াও সেই পঞ্চাশ টাকা রোজগার করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আর এক কথা। আজ কা'ল অনেকেরই একবদ্ রোথ হইয়াছে—ভদ্রলোক হওয়া। আর তাহাদের চক্ষে এবং জ্ঞানে ভদ্রলোক হওয়ার উপায় হইল "ইংরাজী শিখিয়া চাকুরে হওয়া।" চাকুরে হইলেই ভদ্রলোক হওয়া হইল। চুরি করিতে হ'ক, কিংবা মিথ্যা কথা বলিতে হ'ক, তাহাতে কিছু যায় আসে না, ভদ্রতার সম্মানের তাহাতে কোনও ক্ষতি হয় না, চাকুরে হইলেই ভদ্রলোক হওয়া হইল। অতএব আজ কা'ল এই রোগেও অনেককে এ মৃত্যুর দ্বারে টানিয়া আনিতেছে। আজ কা'ল চাকরীর দর মাটীর দর হইয়া পড়িয়াছে; চুরি, জুয়াচুরি, এবং ঘুষখোরের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে।

কিন্তু ইহাতে 'ভদ্রলোক' নামের গায় কোনও আঁচড়টী পর্য্যন্ত লাগে না, বরং গৌরব বাড়িতেছে---ভদ্রলোক নামের বাহাদুরী চওড়া হইতেছে। লোকে এখন জানে কলমের চুরি বড় ভীষণ! আর

তাহাদের কথার মূল্য বড় বেশী এবং কথার দাম এক হাজার। এখন ভদ্রলোক হইতে পারিলেই হইল, একবার চাকরী পাইলেই হইল। তাই চাকরীর দর আজ এত কম, এবং তাই ভদ্রলোকের আজ এই দুর্দ্দশা!

বঙ্গের বর্ত্তমানে সাংসারিক অবস্থা কেমন?

যাই হ'ক, বর্ত্তমানে বঙ্গীয় ভদ্রগৃহের কি অবস্থা, বঙ্গের সাংসারিক অবস্থা আজ কা'ল এই নবযুগে কেমন, বঙ্গীয় ভদ্রসংসারের সুখ শান্তির অবস্থা আজ কা'ল কিরূপ—ইহাই, এখন আলোচ্য এবং দ্রষ্টব্য। অতএব এখন আমরা তাহাই দেখিব।

আজ কা'ল এদেশে ভদ্রলোকদিগের অবস্থা অতি শোচনীয় একথা বোধ হয় অনেকেই অস্বীকার করিবেন না। তাঁহাদের আয়ের অবনতি হ'ক আর না হ'ক, উন্নতি যে হয় নাই এ কথা বোধ হয় সকলেই বলিবেন। চাকরী তাঁহাদের ব্যবসায় ও জীবিকা উপার্জ্জনের একমাত্র ভরসা ছিল। চাকরী ভিন্ন তাঁহাদের আর উপায় নাই। কিন্তু সেই চাকরীর দর আজ কা'ল এত কম! আবার তাহাতেও একটা স্বতন্ত্র খরচ আছে। ব্যয়ের অঙ্ক আজ কা'ল এত বাড়িয়াছে যে কুলন করিয়া উঠা মুস্কিল। অনেক সময়ই দোকানে ধার রাখিতে হয়।

চাকুরেদিগের অবস্থা।

এখনও অনেকের ধারণা চাকরী করিলে বড় লোক হওয়া যায়। যাহারা চাকরী করে তাহারাই বড়লোক বা বড় লোক হয়। সুতরাং চাকরী করা বিশেষ সম্মানের কথা, এবং চাকরী যিনি করেন তিনি সম্মানের পাত্র—সম্মানী। এই সম্মানটা লোকে লোকের নিকট হইতে আসল দিক্ হইতে যতটা পাক আর না পাক, টাকার দিক্ হইতে পাইত এবং এখনও সেই দিক্ হইতেই পাইয়া থাকে। লোকে দেখে মাহিনা দুইশত, চারিশ, কি দশ শ? এ অবশ্য সহরের কথা, বাহিরে মফঃস্বলে পল্লীগ্রামে দশ, বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ কি একশ'? কোন ব্যক্তি উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত তাহা তখন টাকার কাটিতে ওজন হইয়া থাকে। কিন্তু চাকরীর পালায়। অন্য পালায় হইলে ভদ্রলোক হইল না, বাবু হইল না, বা বড় লোক হইল না। সুতরাং ভদ্রলোক, বাবু, বা বড় লোক হইতে হইলে চাকুরে হওয়া চাই। দশ টাকা মাহিনার চাকুরের সম্মান, যিনি অন্য ব্যবসায় মাসে পঞ্চাশ টাকা উপার্জ্জন করেন তাঁহার চেয়ে বেশী। তাই সহরে, বাজারে, গ্রামে, ঘরে, সর্ব্বত্র চাকুরীর আদর বেশী।

আরও বিশেষ কারণ এই, চাকরীতে ভয় ভাবনা অনিশ্চয়তাদি কিছুই নাই। সয়ে ব'য়ে থাকিতে পারিলে মাসের শেষে গণা-গাথা রোক্ কয়েকটী টাকা আসিবেই, তাহাতে অন্যথা হইবার যো নাই। সুতরাং নিশ্চিন্ত—কোনও গোলমাল নাই। বঙ্গদেশে "যেমন তেমন চাকরী ঘি ভাত," অতি প্রসিদ্ধ কথা।

কিন্তু বর্ত্তমানে বঙ্গীয় ভদ্র সমাজে এই প্রসিদ্ধ প্রবাদের প্রচলন অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। কেন না, এখন তাহারা চাকরীর মাহাত্ম্য যে কি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। তাহারা এখন দেখিতে পাইয়াছে যে "ঘি ভাতের" 'ঘি' আর এখন ভাগ্যে হইয়া উঠে না, আ'জ কা'ল কেবল দুই বেলা তাড়াতাড়ি এক মুটা করিয়া 'ভাতে ভাতই' অতিকষ্টে হইয়া থাকে। কিন্তু মফঃস্বলের লোকের এখনও সে খেয়াল হয় নাই। বনিয়াদি ভদ্র লোকেরা যদিও এখন ইহা বুঝিতে কতকটা সক্ষম হইয়াছে, কিন্তু "নবপর্য্যায়ের" ভদ্রলোকেরা এখনও চাকরীর "ঘি ভাত" অতি উপাদেয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাহাদের ভাই, ভাগিনা, ছেলেপুলে কেহ কোথায়, এমন কি দশ বিশ কিংবা পঁচিশ টাকা মাহিনায় কোন স্থানে চাকরীতে নিযুক্ত হইলে বা থাকিলে তাহারা বৎসরে পঁচিশ ত্রিশ টাকা ব্যয় করিয়া অন্ততঃ তিনবার তাহাকে দেখিতে যা'ন এবং পথে কেহ তাঁহাকে তিনি কোথায় যাইতেছেন জিজ্ঞাসা করিলে সগৌরবে একটু অহংকারের সহিত কপাল কুঞ্চিত করিয়া নাসাগ্র একটু স্ফীত কিন্তু সামান্য মর্দ্দিত করিয়া একটু বক্রদৃষ্টে কহিয়া থাকেন—তিনি অমুক স্থানে যাইতেছেন, তথায় তাঁহার ভাই, ভাগিনা কিংবা পুত্র চাকরী করেন। বাড়ীতে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে "অমুক কোথায় আছে?" তাঁহারা স্বগর্ব্বে উত্তর করেন "সে অমুক স্থানে চাকরী করে।" কিন্তু চাকরী যে কি তাহার ত কথাই নাই। আদালতের পিয়াদাও হইতে পারে, মফঃস্বল সহরে পোনের টাকার কেরাণীগিরীও হইতে পারে। কিন্তু

তবু চাকরী, তথাপি "ঘি ভাত!" হায়রে, কি আস্বাদই বটে! এই আস্বাদ যে শুধু তাহারাই পায়, তা নয়, তাহাদের ঝি বউরা পর্য্যন্ত এই আস্বাদের একটু একটু পাইয়া থাকে এবং জিহ্বার জল ফিরাইয়া লইয়া কামনা করে তাহাদের স্বামীরা যদি চা'কুরে হয়! যেমন তেমন কোনও চাকরী যদি তাহাদের হয়? তাহারা যদি এই "ঘি ভাত" নিজের করিয়া খাইতে পারে! হায়রে চাকরী! সে কি সুখের জিনিস! যে করে, তা সেই বুঝে। আর "ঘি ভাত" যে কি মিষ্টি খাদ্য (তা) যে খেয়েছে সেই জানে। কিন্তু এ 'ঘি' যে কোথা হইতে আইসে কে তাহার খোঁজ ক'রে? এ 'ঘি' যে তাহাদের সুখের নিদান, প্রেমসিন্ধু ভালবাসার ধন সাধের স্বামীর শরীরশোষিত 'ঘি', এ কথা কি তাঁহারা বারেকের তরে ভাবিতে পারেন? সেই ক্ষমতা কি তাঁহাদের আছে? নবপর্য্যায়ের ভদ্রভবনে এখনও সেই ভাবনা প্রবেশ করে নাই। কেন না, শিক্ষা সেখানে অতি সঙ্কুচিত; সুতরাং চিন্তাশক্তির সেখানে একেবারে অভাব। কিন্তু আলো সেখানে অপর্য্যাপ্ত, হাওয়া সেখানে অনেক রকম। বিদেশী বাতাস, বিলাতি সাবান, তৈল ও জলের সুবাস বহিয়া লইয়া সেখানে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছে। নব-পর্য্যায়ের ভদ্রভবনের অন্তঃপুরে নূতন সভ্যতা নূতন রাগে রঞ্জিত হইয়া প্রবেশ করিয়াছে। অন্তঃপুরে চাকুরে'র ডাক পড়িয়াছে। বাড়ীর বউরা চাকুরে স্বামীর কদর বুঝিয়াছে। এবং কুমারীগণ চাকুরের আদর করিতে শিখিতেছে। কিন্তু চাকুরের কি অবস্থা? আর চাকরে-ভাবিনীদের কি ব্যবস্থা! কি সুখ! কি শান্তি! কি

পরিতাপ! কি অশান্তি! একই ক্ষেত্রে, একই চিত্রপটে কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য! কি অপূর্ব্ব অভিনয়!

কিন্তু লোকের কি ভুল ধারণা! যাহারা দু'শ, চা'রশ কি পাঁচশ টাকা মাহিনা পায়, না জানি তাহারা কত টাকা জমা করে! না জানি তাহারা কত বড় লোক! বুঝিবা তাহাদের সঙ্গে কথা বলা কত ভাগ্যের কথা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সব লোক একবার ভাবিবারও অবসর পায় না, তাহাদের ভাবনাতেও আসিতে পারে না যে ঐ সকল কাপড় চোপড় চাপরাশাদি খুলিয়া ফেলিলে তাহাদের ন্যায় চা'কৃরেরাও মনুষ্য দেহধারী মানুষ; কৃষ্ণ ততক্ষণই কৃষ্ণ যতক্ষণ সে ধড়াচূড়া ও বংশীধারী এবং তার পর সে যে গোপবালক, সেই গোপ বালকই।

তারপর চাকৃরেদের আয় এবং তাহার ব্যয়ের ব্যবস্থা! এখানে কি গুরুতর ব্যাপার! যাহার মাহিনা পাঁচশত টাকা; তাঁহার মাসিক ব্যয় পাঁচশত টাকাই। তবে কোনও ক্ষেত্রে বা কিছু বেশী, কোথাও বা কিছু কম। মোট পাঁচ শত টাকা মাহিনার (চাকরীর পদের উচ্চতানুযায়ী) পদের উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদ গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদির ব্যয় মাসে এক শত টাকার কম নয়। পদের উপযুক্ত একখানা বাড়ীর মাসিক ভাড়া ন্যূন পক্ষে আর এক শত টাকা। তারপর চাকর বাকর, ঝি চাকরাণী প্রভৃতির মাহিনা পঁচিশ ত্রিশ টাকা। অতঃপর ধোপা নাপিত, মেথর মালী প্রভৃতির মাহিনা। ইহার পর ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার খরচ। তৎপর মূল খরচ—এতগুলি লোকের খোরাকী, ছেলে মেয়েদের জন্য

খাবার, বাবুর চা-চুরুট, তামাক টিকে, কয়লা ইত্যাদি। অবশেষে কাপড় চোপড়। তারপর বাবুর ও গৃহিণীর মন বুঝিয়া অতিথি অভ্যাগত কিংবা নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ, ভোজ ভদ্রতা—কত দরকার? পাঁচ শত টাকায় কুলায় কি? ইহার পর গৃহিণীর ফর্‌মাইশ। তারপর আবার ছেলেদের ফর্‌মাইশ। কিছু থাকিতে পারে কি? থাকিবার সম্ভব কি? আমার এক বন্ধু আছেন, তিনি পাঁচ শত টাকা মাহিনার ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহার সংসারখানি দেখিলে মনে বড় সুখ হয়। সংসারে ছেলে মেয়ে সকলেই শিক্ষিত। যেন সব সোনার চাঁদ। কিন্তু বন্ধুটীর মুখের দিকে তাকাইলে বড় দুঃখ হয়। আমার আর একজন বন্ধু আছেন তিনি ইঞ্জিনিয়ার। মাসে তিনি সাত শত টাকা করিয়া মাহিনা পান। তিনি প্রায় প্রায়ই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দেখা দিতেন। কিন্তু কেহ কখনও ধারণাও করিতে পারিত না যে তিনি সাত শত টাকা মাহিনার ইঞ্জিনিয়ার। আমার এখানে আসিতে কখনও আমি তাঁহাকে গাড়ী ঘোড়ায় আসিতে দেখি নাই। তবে অফিসের পোষাকে অবশ্যই তাহাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়াছি। তারপর দু'শ কিম্বা এক শত টাকা যাহারা মাহিনা পায় তাহাদের কথা তো বলিতেই নাই। তাহাদের তো ট্রামের পয়সা জুটিয়া উঠে না। তারপর আমার এক বৃদ্ধ বন্ধুর কথা বলিব। তিনি সত্তর টাকা মাহিনা পাইতেন। পনের টাকার এক অস্বাস্থ্যকর বাড়ীতে বাস করিতেন আবার তাহারও সম্পূর্ণটা তিনি ভোগ করিতে পারিতেন না; পাঁচ টাকার জন্য তাহারও খানিকটা তিনি আবার ভাড়া

দিতেন। ছেলেপিলে কাহাকেও পড়াশুনা করান ত দূরের কথা, ব্যাধি হইলে তাহাদের রীতিমত চিকিৎসা করাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। তারপর, কোনও মাসে দোকানে দু'চা'র টাকা ধার হইত, আবার পরের মাসে তাহা শোধ করিতেন। এই তিন রকম চাকুরের অবস্থা। তারপর দশ, বিশ, পঁচিশ কি পঞ্চাশ টাকা যাহাদের মাহিয়ানা তাহাদের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় তাহা সহজেই অনুমেয়; তাহাদের সম্বন্ধে অধিক লেখাই বাহুল্য। এইত চাকুরেদের সব অবস্থা। আ'জ কালের দিনে, যখন খাদ্য সামগ্রী এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর দাম এত বাড়িয়া গিয়াছে, তখন প্রত্যেকের পক্ষেই তাহার যে আয়, পদের মর্য্যাদা অনুযায়ী তদ্দ্বারায় তাহাদের প্রতি মাসে ন্যায্য ব্যয় সঙ্কুলন করা সব সময় সম্ভবপর হয় না। তবে নেহাৎ যাহাদের আর অন্যগতি নাই, যাহাদের চাকুরী না থাকিলে নয়, তাহারা বাধ্য হইয়া কোনও ক্রমে কাল কাটাইতেছেন। না করিয়া কি করিবেন? পেটে খাইতে হইবে ত? পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে ত? তাহা না করিলে ত আর চলিবে না?

এইত চাকুরেদের অবস্থা। আর্থিক সচ্ছন্দতা কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, কিছুতেই আর্থিক আনুকুল্যের ব্যবস্থা হয় না। মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া এই পর্য্যন্তই তাহারা করিতে সক্ষম, ইহার বেশী ত আর বর্ত্তমান সময়ে হয় না; এবং এই জন্যই শরীরের রক্ত জল করিতে হয়, তবেই এই টুকু হয়। তাহ'লে ইহা হইতেই দেখা যায় যে এই চাকুরী করিয়া শারীরিক তাহারা কতটা সুখী!

এই ত চাকুরেদের বর্ত্তমান অবস্থা। কিন্তু চাকুরে ভাবিনীরা তাঁহাদের এই অবস্থার কি কি ব্যবস্থা করেন তাহাই এখন দেখা দরকার।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমরা যেমন সভ্য হইয়াছি এবং জামা, জুতা, মোজা ইত্যাদি পরিতে শিখিয়াছি, সভ্যতার হাওয়া আমাদের অন্দরমহলে ঢুকিয়া তথায় আবার সভ্যতার উপকরণের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। আর চাকুরে ভাবিনীরা প্রতিদিন নূতন রকমের ফরমাইস তাঁহাদের পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত পতিদের উপর চাপাইতেছেন। কেহ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া দু'কথা বলিয়া আরও বিপজ্জালে জড়িত হইতেছেন, আর কেহবা নাক কান বুজিয়া নিরুদ্বেগে সহিয়া গেলেন, ফরমাইসটা অন্য সময় শুনিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া অব্যাহতি পাইলেন। আর তাহা না হইলে, নিরন্তর উৎপীড়ণ অত্যাচার ও অকারণ গোলমাল চলিতে লাগিল। যে পর্য্যন্ত না ফরমাইস অনুযায়ী জিনিস আনা হয়, সে পর্য্যন্ত এই অত্যাচার নিবারণ করা একরূপ অসম্ভব। তাহাদের দিন দিন নানা প্রকার দেশী বিলাতী জিনিষের আবদার, আজ অমুক রং এর অমুক রকম পাড়ের ঐ কাপড় খানা, কা'ল অমুক ফরাশী ফ্যাসানের লেসদার একটা জামার, পরশু অমুক নামের বড় সুন্দর নূতন রকমের গন্ধবিশিষ্ট বিলাতী আতরটা, ও দিন গৃহিণীর ঘূরাণী উঠিয়াছে, সুতরাং সুগন্ধি একটা তৈল, সেদিন তাহার কান্তির কমনীয়তা বৃদ্ধির জন্য এক বাক্স পিয়ার্স সোপ (সাবান), আর একদিন একটা লেসদার সেমিজ, কারণ সেটা

বাজারে নূতন, অন্য দিন একসেট নূতন ধরণের চা পানের সরঞ্জাম, ইত্যাদি বিলাতী রকমের—, আবার তারপর দেশী রকমের, আজ নাকছাবিটা, কা'ল নূতন রকমের আটগাছি চুড়ী, পরশ্ব বালা জোড়া ভাঙ্গিয়া ঐ নূতন রকম করিয়া দাও, ও দিন অনন্ত দু'টা কেমন হইয়া গিয়াছে সুতরাং রকমওয়ারী করা দরকার, সেদিন চক্ ভাঙ্গিয়া নেক্লেস করিয়া দাও, ইত্যাদি হরেক রকমের আব্দার করিয়া ক্লান্ত ক্লিষ্ট কলেবর স্বামীকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া উঠান। কাজে কাজেই স্বামীবর ঘরের সুখ অফিসে যাইয়া ভোগ করিতে বাধ্য হ'ন। এই হইল দু'শ' চা'শ', পাঁচ শ' কিংবা হাজার টাকা দরের চাকুরে-ভাবিনীদের ব্যবস্থা। তার পর, দশ, বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ কি পঁচাত্তর টাকা দরের চাকুরেদের ভাবনীদিগের ব্যবস্থা যে কিরূপ তাহাতো বলাই নিষ্প্রয়োজন। প্রায় অধিকাংশ স্থানেই "বৎসরে বারেক মিলে মাসেকের তরে।" ইহারা প্রায়ই পল্লি-বাসিনী, ভদ্রগৃহিণী ও ভদ্রনন্দিনী। ইহারা সাধারণতঃই স্বামীকে ভয় করিয়া চলে। কেননা, "যদি ফেলে যায় পুনরায় বৎসরের তরে, যদি বা না আসে ফিরে দু'চার বছরে ?" তাহারা ভীতা ও সংযতা হইয়া থাকে এবং যদিও নূতন সভ্যতা, নূতন হাওয়া, নূতন অভিলাষ তাহাদের ভিতরেও প্রবেশ করিয়াছে, তথাপি তাহাদের সেই অভিলাষ পূর্ণের ভার স্বামীর উপরে। তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ হওয়া স্বামীর কর্ত্তব্যজ্ঞান ও দয়া সাপেক্ষ। অবশ্য এইটী ভদ্র ঘরের কথা—বনিয়াদী ভদ্রলোকের মেয়ের কথা। ইহারা শাশুড়ীর গঞ্জনা ও ননদের লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াও বরের ঘর করিয়া থাকে। ইহাদের

ভোগাবিলাসের বাসনা সব স্বামীর চরণতলে ন্যস্ত। তিনি ক্ষমতা অনুযায়ী দয়া করিয়া যাহা করেন। আর যাহারা নবপর্য্যায়ের মানে নূতন ভদ্র ঘরের মেয়ে নূতন সভ্যতায়, নূতন হাওয়ায়, নূতন ভাবে অনুপ্রাণিতা, তাহারা স্বামী ঘরে আসিলেই "এটা চাই, ওটা চাই, সেটা চাই, এ রকম জিনিস এ পরে ও পরে সে পরে, সুতরাং আমায় দাও, দেবে না কেন?" বলিয়া ব্যস্তসমস্ত করিয়া তুলে। "এ গহনা খানা দাও, সে কাপর খানা দাও, ও সেমিজ টা চাই" করিয়া সব সময় কেবল যন্ত্রণা বাড়ায়। আর না দিলে, অন্য কোনও কারণে অপারগ হইলে এবং পরে দিতে চাহিলে, তবে, "তোমায় দিয়া দরকার কি? তুমি থেকে যদি আমার সাধ না মিটিতে পারিল, বাসনা না পূর্ণ হইতে পারিল, তবে তুমি থেকে লাভ কি? তুমি না থাকিলে কি আর চলিবে না? তুমি না আসিলে কি আর দিন যাইবে না? বিধবারা কি আর বাঁচে না? তুমি মরিলে কি আর আমাকে থাকিতে হইবে না? যদি তোমাকে দিয়া আশাই না মিটিল, তবে তোমায় দিয়ে কি দরকার? এখন "আর তো কিছুর" দরকারই নাই, তাহা হইলে আর কেন? তুমি থাকিয়া যদি "খাবার প'রবার" সাধই না মিটিতে পারিল, তবে তুমি না থাকিলে ক্ষতি কি? আমার পেটের ভাত আর প'রবার কাপড় আমিই যোগাড় করিয়া লইতে পারিব। পেটের ভাত এবং প'রবার কাপড়ের জন্য, আর না পারি, বৈরাগিণী হইব—ভিক্ষা করিব। না হয়, অন্যের বাড়ীতে চাক্‌রাণী হইয়া পেটের ভাত আর প'রবার কাপড় যোগাড় করিব; তবুও তোমার থেকে দরকার নাই

তোমার কাছে, আর যাইব না। "এই সময়ই" যদি চলিয়া যায়, যখন খাবার পর্‌বার সময়, তখনই যদি না পাইলাম, না হইল, তবে পরে দিয়া আর দরকার কি? তখন ত লোকে থাকিলেও পরে না! সুতরাং এখনই যদি না হইল, তবে আর হইল না, দরকারও নাই। কারণ, 'যা হয় না বিয়ের রা'তে, তা আর হয় না কোন কালে।' অতএব আমি চাই না। আর দরকার নাই। যদি খাওয়াইয়া পরাইয়া সুখী করিতে না পার, যদি খেয়ে পরেই না সুখী হইতে পারিলাম, তবে আর তোমাকে দিয়ে দরকার কি?" এইরূপ সুমিষ্ট বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতে থাকে। দিনে দু'বেলা তিন বেলা, যখন তখন ঝগড়া-ঝাটি করিয়া স্বামীকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট এবং আপন আত্মীয়বর্গের নিকট ও অন্য জনসমাজে স্বামীকে অবনত হইয়া থাকার উপায় করিয়া তাঁহাকে কলঙ্কিত, নিন্দিত বা উপেক্ষিত করিয়া রাখার পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। ইহারা নূতন সভ্যতায়, নূতন হাওয়ায়, নূতনভাবে অনুপ্রাণিতা। ইহাদের নূতন ধারায় চরিত্র গঠিত, নূতন রকমে ইহারা চালিতা ও শিক্ষিতা। ইহাদের মুখে সীতা সাবিত্রীর কথা নাই, রামায়ণ মহাভারত ইহাদের নিকট অপরিচিত। ইহারা এ দেশী আদর্শে গঠিত নয়, এ দেশীভাবে অনুপ্রাণিতা নয়, সে ভাব ইহাদের ভিতরে নাই। ভোগবিলাসই ইহাদের একমাত্র ভাব্য বিষয়। ভোগবাসনা কিরূপে পূর্ণ হইতে পারে তাহাই তাহাদের একমাত্র ভাবনার বিষয়। তাহাদের এই চরিত্র কখনও সংশোধিত হইতে পারে না, তাহাদের চরিত্র বোধ হয়

আবার করিয়া গঠন করা যাইতে পারে না, কেন না, "নষ্ট দুধে ক্ষীর জমে না।"

আর এক কথা, যাহারা এই বিদেশী আদর্শে শিক্ষিতা ও গঠিতা, এবং বিদেশী হাওয়া হাব ভাবে অনুপ্রাণিতা, এ দেশীয়দের ন্যায় স্বামিসুখে সুখী নয়, স্বামীর দুঃখে অনুগামিনী নয়, যাহাদের নিকট স্বামিপূজা কথার কথা। যাহাদের স্বামীর সুখ, শান্তি কিংবা স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি মাত্র নাই, কিন্তু তাহাদের রৌপ্য প্রাপ্য এবং ন্যায্য দাবী সুতরাং তাহাই যাহাদের শিষ্টতায় একমাত্র দ্রষ্টব্য, তাহাদের নিকট হইতে হতভাগ্য স্বামীর মিষ্টি কথা, স্বামিভক্তি, স্বামি-পূজা কি ভালবাসার আশা করা, মূর্খতার পরিচয় মাত্র। কারণ, ঐ সমুদয়, কেবল এ দেশী আদর্শে গঠিতা সতী স্বাধ্বীদিগের নিকট হইতে পাইবারই আশা করা যাইতে পারে; কিন্তু ঐরূপ আদর্শে গঠিতা ঐ প্রকার ভোগবিলাসের ভাবে মাত্র অনুপ্রাণিতা নূতন ধরণের স্ত্রীর নিকট হইতে আশা করা যায় না। এ সব স্ত্রীদের উদ্দেশ্য ভোগবিলাস, এবং তাহার জন্য, বোধ হয়, সকলই করিতে পারে। অতএব, তাহাদের ভোগবাসনা পূর্ণ করিতে স্বামীবরেরা অসমর্থ হইলে, তাহাদের নিকট হইতে সতীত্ব কিংবা স্বামিপূজার দাবী না করিয়া, তাহাদিগের নিকট অন্যরূপ আশা করা উচিত। তাহা-দিগের নিকট হইতে পতিভক্তি কি পতিপূজা পাইবার আশা করা মূর্খতা। কেন না, অসতীর নিকট সতীত্ব পাওয়া অসম্ভব। ইহা ধ্রুব সত্য।

যাহাই হ'ক, কেবল বনিয়াদী ভদ্র ঘরের মেয়ে ভিন্ন অন্য

চাকুরে ভাবিনীদের বর্ত্তমানে এই বঙ্গদেশে এই রূপই ব্যবস্থা। কি ভীষণ ভাব! এই বঙ্গে এ কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এই আর্য্যভূমে আ'জ একি আশ্চর্য্য শিক্ষ দীক্ষা!

কিন্তু এরূপ শিক্ষা-দীক্ষা এদেশের পক্ষে বড় বিষম, এ দেশ-বাসীর পক্ষে বড় সাঙ্ঘাতিক এবং এ হিন্দু সমাজও এ হিন্দু ধর্ম্মের উপর বড় ভয়ানক অনাচার ও অত্যাচার। কেন না, এই ব্যবহারা-নুযায়ী গরীবের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করা অসম্ভব। কারণ এদেশী দরিদ্রের সে বিলাতি সভ্যতার যোগান দেওয়া কথনই সম্ভবপর নয়; কেন না, তাহাদের উপার্জ্জন অতি অল্প। এই অল্প আয়ে সেই অধিক খরচার সভ্যতার যোগান দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার, সম্ভবপর নয়। সুতরাং গরীবের পক্ষে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করা অসম্ভব। এই যদি হয়, তবে তাহা যে এ দেশের পক্ষে বড়ই ভীষণ। এ দেশ যে গরীবেরই দেশ! এখানে যে সবই গরীব! কিন্তু যাহারা গরীব, যাহাদের ধৈর্য্য ধারণ করিয়া সংসার গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহারা প্রাণে প্রাণে গার্হস্থ্য ধর্ম্মকে ভালবাসে, যাহারা সংসারে সংসারীর বেশে উন্নতি করিতে একান্ত ইচ্ছুক ও কৃত-সংকল্প, এবং যাহারা সংসারে উন্নতির জন্য শরীরের প্রত্যেক শক্তিবিন্দু সংযোজিত করিয়াছে ও করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিতে প্রস্তুত, এবং যাহারা সংসারে উন্নতির জন্য প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম করিতেছে, তাহাদের পক্ষে এ ব্যবস্থা কি ভীষণ! এরূপ শিক্ষা কি সাঙ্ঘাতিক! কি প্রাণঘাতী! যাহাদের অসীম উদ্যম ও অতলস্পর্শী অধ্যবসায় এবং যাহারা সংসারীর বেশে

সংসারীর সাজে সংসারে উন্নতির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছে, যাহারা স্ত্রীর সামান্য মাত্র সাহায্য—না, সহানুভূতি পাইলে, যাহারা, তাহাদের স্ত্রী দয়া করিয়া তাহাদের পথে প্রতিবন্ধক না জন্মাইয়া কেবলমাত্র তীব্রভাব ত্যাগ করিয়া একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অশান্তির সৃষ্টি না করিলেই—বৃথা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়া অশান্তির উৎপাদন করিয়া স্বামীর চিন্তার সময় হরণ না করিলেই, সংসারে অতিশয় উন্নতি লাভে সক্ষম হইতে পারে, এবং সাধারণাপেক্ষা অনেক অধিক কাজ করিতে পারে ও অনেক বেশী ক্ষমতা বিস্তার করিতে সক্ষম হয়, তাহাদের পক্ষে এরূপ নবপর্য্যায়ের ভদ্রলোকদের নবভাবে অনুপ্রাণিতা, অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা, কিন্তু নূতন ধারায় গঠিতা ও শিক্ষিতা—দীক্ষিতা স্ত্রীদের এই সব ব্যবস্থা কিরূপ বিনাশকারী। কি ভয়ানক ও কি বিপজ্জনক!

সংসার-পাখীর দু'টী পাখা। কেন না, দুইটী পাখারই দরকার; কারণ, একটীর দ্বারা উড়া যায় না। উড়িতে হইলে দু'টী পক্ষ চা'ই, শুধু এক পক্ষে চলে না। সংসার করিতে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ই দরকার, একজনে চলে না; একজন দ্বারাই সংসার হয় না, একজন হইলে সংসারে উন্নতি হইতে পারে না। সংসার-আকাশে অতি উচ্চে আরোহণ করিতে হইলে অতি উত্তম দু'টী পাখার আবশ্যক। সংসারে উন্নত হইতে হইলে, সংসারে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতে চাহিলে, ঘরে এবং বাহিরে অতি উত্তম স্ত্রী এবং পুরুষ হওয়া দরকার। সংসারের উন্নতি অবনতির জন্য স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে সমান ভাবে দায়ী। পুরুষ বাহির হইতে

প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিয়া ধনরত্ন ভিতরে লইয়া আসিবে, আর স্ত্রী পরমযত্নে সে সব পরিষ্কার করিয়া ঘরে আনিয়া গুছাইয়া রাখিবে। স্বামী যেমন বাহুবলে বিজয় করিয়া ধনরত্ন আনিবেন, স্ত্রী তেমনই বহুযত্নে বহু আয়াসে সেই সমুদয় সুন্দর করিয়া গুছাইয়া রাখিবেন, একটী তৃণও নষ্ট হইতে পারিবে না। স্বামী যেমন সংগ্রহ করিবেন, স্ত্রী তেমনই সংস্থাপন ও সঞ্চয় করিবেন। এইরূপ হইলে তো সংসার হয়, সংসারে উন্নতি হয়, সংসারপাখী উচ্চে উঠে। কিন্তু যদি পাখীর একটী পাখা ভাঙ্গা হয় কিংবা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে কি হইবে? কেবল গড়াইবে অথবা আকাশপথে উড্ডীয়মান হইয়া শেষে আবার ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িয়া মরিবে। সংসারে স্ত্রী কি পুরুষ যদি কেহ অনুপযুক্ত হয়, কিংবা অবহেলা করে, তবে আর সংসারের উন্নতি কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? সেখানে কি প্রকারে সংসারধর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? কিরূপে সংসার উন্নত হইতে পারে? সংসারের উন্নতি অবনতির জন্য স্বামী স্ত্রী উভয়ে সমানভাবে দায়ী। এবং কর্ত্তব্যও পরস্পর। একচোখো নয়। পরস্পরই পরস্পরের জন্য সমান ভাবে কর্ত্তব্যাবদ্ধ ও দায়ী। শুধু একজন নয়। সুতরাং যদি একে অন্যকে মাত্র কর্ত্তব্যাবদ্ধ মনে করে এবং সংসারের উন্নতি অবনতি অন্যান্য সকল প্রকার দায়ী বোধ করিয়া নিজকে সর্ব্ব প্রকারে মুক্ত মনে করেন ও সর্ব্বক্ষণ অপরকে উৎপীড়ন করেন, তবে কি প্রকারে সংসার-বৃক্ষটী সংবর্দ্ধিত হইতে পারে? এক পক্ষে উড়িতে পারা যায় না, একজনে সংসার করা হয় না।

কিন্তু আজ কালের নূতন সভ্যতালোকে আলোকিতা নূতন শিক্ষায় শিক্ষিতা নূতন ধারায় নূতন ধাঁচে গঠিতা নূতন ভাবে অনুপ্রাণিতা ও নূতন হাওয়ায় আলোড়িতা স্ত্রীদিগের ব্যবস্থা অন্যরূপ। তাঁহারা মনে করেন "বিবাহ করিলেই স্বামী স্ত্রীর ভরণ পোষণের জন্য সর্ব্ব প্রকারে দায়ী, তিনি স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য। স্বামী অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা সংসারের উন্নতির বিধান করিবেন। সংসারের উন্নতির জন্য স্বামীই সর্ব্ব প্রকারে দায়ী। অবনতি হইলে কিংবা উন্নতি না হইলেও তিনিই তজ্জন্য দোষী। সংসারের উন্নতি করিয়া তাঁহাদের ভোগবিলাসের বাসনা পূর্ণ করিতে স্বামী বাধ্য। অন্যথা তাঁহাদের কি? স্বামী যদি এই সব করিতে না পারেন, তবে তাঁহার প্রয়োজন কি? তিনি না থাকিলেও তাহা হইলে চলিতে পারে? বিধবারা কি আর বসবাস করে না। ইত্যাদি"। তাঁহাদিগকে সাংসারিক কোনও কাজের কথা বলিলে তাঁহারা তাহাতে মনোযোগ দেন না, বরং অবহেলা করেন; আর তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কিছু বলিলে, তাঁহারা বলেন 'পারিব না, লোক রাখিয়া দাও।' তাঁহাদের চোকের সম্মুখে স্বামীর প্রাণপাত পরিশ্রমের জিনিষ তাহাদের আলস্য বা অবহেলার দোষে নষ্ট হইতে থাকিলে এবং তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে কিছু বলিলে তাহারা অবলীলা ক্রমে বলিয়া থাকেন "হোক্ না, থাক্ না, আমার কি?" কি ভয়ঙ্কর কথা! তোমার চোকের উপরে পতির প্রাণপাত পরিশ্রমের সামগ্রী বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে, আর তুমি বলিতেছ "আমার কি? লোক রেখে দাও!" তবে তোমার দরকার কি? তুমি কি? তোমার দ্বারা

কি হইবে? তুমি কি করিবে? সংসারে তোমার কি দরকার? কি বিনাশকারী বাক্য! এইরূপ ভাবে স্ত্রীদের এই প্রকার আচরণে কেবল যে সংসারের সামান্য একটু জিনিষপত্র নষ্ট হয় তাহা নহে, এইরূপে কত সোনার সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে। আমি স্বচক্ষে কয়টী সংসার বিনাশ পাইতে দেখিয়াছি। একটী ভদ্রলোক অতিশয় পরিশ্রম করিয়া ও তাঁহার স্বামিপ্রাণা গুণবতী ভার্য্যার সাহচর্য্যে অতি সামান্য অবস্থা হইতে একজীবনে প্রায় বার কি তের হাজার টাকা আয়ের স্থাবর সম্পত্তি করেন এবং প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা লগ্নি কারবারে নিযুক্ত করেন। ইতি মধ্যে স্বামী পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া তাঁহার সতী সাধ্বী গুণবতী ভার্য্যা পরলোক গমন করেন। ভদ্রলোক কয়েক মাস পরে পুনরায় দার-গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এবং কিছুকাল পর উপযুক্ত ছেলেদিগকে বিবাহ দেন। ফলে একটীর স্থানে অল্পদিনের মধ্যেই ঘরে অনেকটী যুবতী স্ত্রীলোকের আবির্ভাব হইল। ভদ্রলোক তখন আশা করিলেন সংসারে এখন সাংসারিক কাজের লোক অনেক, সুতরাং সংসারের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে। কিন্তু অল্পদিনের ভিতরেই ভদ্রলোক বুঝিতে পারিলেন তাঁহার সে আশা বৃথা; তিনি ভুল করিয়াছেন। সুতরাং পরিণামে ফলভোগ করিতে হইবে এবং তজ্জন্য অনুতাপিত হইতে হইবে। শুধু তাই নয়, তিনি ভাবিলেন সংসারখানি রাখিয়া যাইতে পারিলে হয়। কারণ তিনি স্বচক্ষে দেখিতে পাইলেন পূর্ব্বে যেকাজ একজনে সম্পন্ন করিত, এখন চারিজন দ্বারাও তাহা সম্পন্ন হয় না। তিনি দেখিলেন, গল্প করিবার সময়

শাশুড়ী, বউ, ঝি সকলে মিলিয়া গল্প গুজব করেন, উচ্চহাস্যে অন্দর-মহল আলোড়িত করিয়া দেন, কিন্তু কাজের বেলায় ছাট্-ছুট যে যাহার আপন ঘরে যাইয়া দরজায় অর্গল দিয়া শুইয়া পড়েন। এমন কি, অনেকদিন রান্নাঘরের দরজা পর্য্যন্ত খোলা হওয়া মুস্কিল হইয়া দাঁড়ায়। বউরা সব গল্পের বেলায় গল্প করেন, কিন্তু কাজের বেলা বলেন "আমার কি? আমি কি দায়ে পড়িয়াছি?" শাশুড়ী, বউ সকলের মুখেই ঐ একই কথা "আমার কি? আমার কি দায়?" আর কিছু বলিলেই তাহারা যে যাহার স্বামী ও শ্বশুরের "সম্মান" করিতেন। কারণ, তাঁহারা তাহাদের ভোগবিলাসের বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন না কিংবা করেন না অথবা করিতে পারেন না; তাহাদের বিলাসের সামগ্রী গুলি যথারীতি সরবরাহ করা হয় না।

যাই হ'ক, ভদ্রলোক এই অবস্থায় আর অধিক দিন সেই অসুখের সংসারে অবস্থান করিতে রহিলেন না; অভাবনীয় ঘটনাবলী দর্শন করিয়া লজ্জা, ঘৃণা এবং দুঃখে অতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন এবং পরিশেষে কাল আসিয়া তাঁহার কেশ ধারণ করিল, তিনি বৎসরখানি ভুগিয়া অবশেষে কালের করাল গ্রাসে আত্মসমর্পণ করিলেন। সংসারখানি শেষ বেলায় একেবারে মা বাপ শূন্য হইয়া পড়িল। পরে তাঁহার স্থান যাহারা অধিকার করিল, তাহারা তেমন উপযুক্ত না হওয়াতে বাড়ীর স্ত্রীলোকদের অত্যাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহারা সংসারের সামগ্রীর সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। প্রত্যেকের বাক্সে তখন বিলাসের সামগ্রী বসবাস করিবার সুযোগ পাইল।

সংসারখানি অমুন্নত এবং অবশেষে ভগ্নদশায় দণ্ডায়মান হইল। রাখে কে? যাহারা রাখিবার তাহারাই যে ভাঙ্গিতেছে। থাকিবে কিরূপে? তাহারা যে চায়ই তাই। তবে থাকিবে কিরূপে? অতএব অল্প দিনের মধ্যেই এমন সুখের সংসার খানি ছারখার হইতে বসিল। আজকালএর স্ত্রীলোকদের গুণপনা মহিমা এই প্রকারই বটে!

আর একটী ভদ্রলোকের অবস্থা আরও শোচনীয়। তিনি কুলীন ঘরের ছেলে, অবস্থা একটু খারাপ হইয়া পড়ার দরুণ কতকটা সাহায্য হওয়ার আশায় সামান্য কিছু টাকা লইয়া নবপর্য্যায়ের এক অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের মেয়ের পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু বিবাহের অল্প কয়েক মাস পরেই তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার ভুল হইয়াছে। তিনি ঐ সামান্য অর্থের লোভ না করিয়া, অন্য লোক দ্বারা কোনওরূপ উপকারের প্রত্যাশা না করিয়া, যদি কোনও দরিদ্র কিন্তু বনিয়াদী ভদ্রলোকের মেয়ের পাণিগ্রহণ করিতেন, তবে তাহা তাঁহার পক্ষে অশেষ রূপে ভাল ছিল। এবং তদ্দ্বারা তাঁহার অনেক উপকার হইত, তিনি অনুগত স্ত্রী পাইতেন, সংসারে তাঁহার সর্ব্বদা শান্তি বিরাজ করিত, তিনি সুখী হইতেন। কিন্তু এই বিবাহে তাঁহার সাংসারিক বিড়ম্বনার সূচনা হইল, স্ত্রী তাঁহার অবস্থায় সন্তুষ্ট হইলেন না, পরস্পর মতভেদ পরিলক্ষিত হইল, স্ত্রী অবাধ্য হইয়া পাল্কী করিয়া পিতৃভবনে চলিয়া গেলেন। ভদ্রলোক লাজে দুঃখে অবশেষে আত্মহত্যায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং পরিশেষে বিদেশ যাত্রা করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর বিদেশ-

বাসের পর বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত ও ভূষিত হইয়া যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন তাঁহার স্ত্রী, তিনি যথেষ্ট টাকা রোজগার করিবেন আশায়, পুনরায় তাঁহার পাশে আসিয়া জুটিলেন, ভদ্রলোকও পূর্ব্ব বিবরণ সমুদয় বিস্মৃত হইয়া বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁহাকে আবার গ্রহণ করিলেন। এবং স্ত্রীর নিতান্ত অনুরোধে তাঁহার সামান্য আর্থিকসাহায্য লইয়া অচিরে কলিকাতায় পঁহুছিলেন।

ভদ্রলোক যখন পরিবার সহ কলিকাতা পঁহুছিলেন, তখন তাহার সম্বল মাত্র দু'টী টাকা। কিন্তু ভদ্রলোক অশেষ চেষ্টায় জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এবং অল্প কয়েক মাস পরে পাঁচটাকা মাত্র মূলধন লইয়া কোনও একটী কারবার আরম্ভ করিয়া পাঁচ ছয় মাস সময়ের মধ্যে অতুলনীয় উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিয়া সমুদয় খরচ করিয়াও পাঁচ হাজার টাকার উপরে মূলধন দাঁড় করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তখন তাঁহার সংসারে বিড়ম্বনা আরম্ভ হইল। পরিণীতা তাঁহার এই কার্য্যে পরিতুষ্টা হইলেন না। স্ত্রী তাঁহার চাকুরে ভাবিনী। তিনি মনে করিয়া ছিলেন তাঁহার স্বামী এখন একজন বিলাত ফেরত। তিনি বড় একটা চাকরী করিবেন, সবরকম ভোগ-বিলাসের বাসনা অবাধে পূর্ণ হইবে। কিন্তু তাহা না করিয়া এ কি ব্যবসায় করা? ইহাতে কি লোকে বড়লোক হয়? মাসের শেষে মুঠা ভরা টাকা আনিয়া হাতে দিবে, বাসনা পূর্ণ করিয়া বাবুগিরি করিব! তা'না হয়ে একি প্রতিদিন কেবল নানা রকমের খাতা লেখা! একি বড়লোকি? তিনি কয়েক দিন গুমরে হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং অবশেষে একদিন প্রকাশ্যে স্বামীকে

বলিয়া ফেলিলেন "এ ক'রে কি কেউ কখনও বড় লোক হয়? চাকরী করিয়া টাকা করে, তার পর যদি হয় তো ব্যবসায় করিতে যায়! ও মা, এ কি আগেই ব্যবসা! এই ব্যবসায় করেই লোকে বড় লোক হয়?" ভদ্রলোক শুনিয়া প্রমাদ গণিলেন, বিড়ম্বনার সূত্রপাত হইল।

ভদ্রলোক গৃহিণীর ব্যবসায়ে অনভিরুচির বিষয় এক দুই তিন করিয়া ক্রমাগত শুনিতে লাগিলেন এবং তিনিও তাহার বেলায় নানা প্রকারে ব্যবসা চাকরী অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ এ কথা বুঝাইতে প্রয়াস পাইলেন, এবং যখন দেখিলেন যে গৃহিণীর বিলাস বাসনা পূর্ণ হইতে গৌণ হইতেছে জন্যই তাহার এরূপ কাজে আর আস্থা নাই, তখন তিনি গৌণের কারণ দেখাইয়া ব্যবসায়ে তাহার পুনঃ আস্থা জন্মাইতে যত্ন করিলেন। কিন্তু সে যত্নে কোনো ফল হইল না। অতএব তখন তিনি শাসন করিতে লাগিলেন। ফল বিষম হইতে বিষময় হইয়া দাঁড়াইল। দিন রাত্রি অশান্তির আগুন অবারিত ভাবে জ্বলিতে লাগিল, সে আগুনে ভদ্রলোকটী, তাহার সংসার, তাহার কারবার, সমস্ত দগ্ধ হইতে লাগিল, ভদ্রলোক কিছুতেই আর শান্তিবারি সিঞ্চন করিতে পারিলেন না। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কেবল ধূম্ররাশি অবলোকন করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে ওদিকে ব্যবসার ঘরে এই সুযোগে অন্যরূপ ব্যাপার আরম্ভ হইল। ভদ্রলোক একা সব সময় সমস্ত যায়গায় থাকিতে পারিতেন না। সুতাং তিনি যখন বিষয়ান্তরে বাহিরে যাইতেন বাড়ীর সমস্ত ভার অবশ্য গৃহিণীর উপর ন্যস্ত থাকিত। কিন্তু

অসন্তুষ্টা গৃহিণী তৎপ্রতি বড় একটা লক্ষ্য রাখিতেন না; কাজে কাজেই কর্ম্মচারীরা সুযোগ বুঝিয়া যে যেরূপ পারিল চুরি করিতে লাগিল। ভদ্রলোক নিত্য নিত্য কিংবা সপ্তাহে একদিন আয় ব্যয়ের হিসাব দেখিয়া ভাণ্ডার মিল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলেন না, অশান্তি-অনল অনবরত তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল, তিনি অবসর সময় অশান্তির ভয়ে রাস্তায় কাটাইতে লাগিলেন। কর্ম্মচারীরা সুযোগ ছাড়িল না, তাহারা ইহার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল, এমন কি বাড়ীতে যে সব ভি, পি, মনিঅর্ডারের টাকা আসিত, ক্রমে তাহা পর্য্যন্ত চুরি করিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই কারবারটী খোলা খাব্‌রা হইয়া দাঁড়াইল। ভদ্রলোকটী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কারবারের এই অকালে অন্যায় পতন স্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও আর কিছুতেই ইহা রাখিতে পারিলেন না। কতরূপে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু অশান্তি আগুন কিছুতেই প্রশমিত হইল না।

এদিকে সংসারে আর একটী বিবাদের সৃষ্টি হইল। গৃহিণীর অযত্ন বা অবহেলায় কিংবা অন্যায় দৃষ্টির ফলে পারিবারভুক্ত আত্মীয় স্বজন কর্ম্মচারীদের ভিতর দুইটী দল হইয়া গেল, পরস্পর পরস্পারের প্রতি হিংসা করিতে লাগিল। ফলে সংসারটী ছারখার হওয়ার যেটুকু বাকি ছিল তাহা এই আগুনে নিঃশেষ হইতে লাগিল

ভদ্রলোকটী এযাবৎ কাল নিশ্চেষ্ট বসিয়া কেবল তামাসা

দেখিতে ছিলেন না। তিনি কারবার রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। কুক্ষণে বুঝিতে পারিলেন চুরি হইতেছে। বুঝিতে পারিলেন, কাহারা চুরি করিতেছে এবং তাঁহার দুশ্চিন্তা-দগ্ধ মস্তিষ্ক লইয়া তন্নিবারণে প্রয়াস পাইলেন। তিনি নিতান্ত অব্যবসায়ীর ন্যায় কাজ করিলেন, চোরদিগকে একেবারে প্রকাশ্যে একদম সোজাসুজি চোর বলিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ তাড়াইতে কিংবা স্থানান্তরিত করিতে পারিলেন না। চোরেরা পূর্ব্বে কাজ চালাইয়া চুরি করিত, কিন্তু অতঃপর তাহারা কাজ বন্ধ করিয়া পুরা হাতে চুরি আরম্ভ করিল। ভদ্রলোক তখন কেবলমাত্র নিজে কাজ করিয়া যাহা যোগাড় করিতে পারিলেন তদ্দ্বারা সংসার চালাইতে লাগিলেন। আর সমুদয় কাজ কর্ম্ম বন্ধ হইয়া গেল। কারবার এবারের মত ফেল পড়িল।

কিন্তু ভদ্রলোক দমিবার লোক নন। তিনি অন্য ভাবে আবার কারবার পুনর্জ্জীবিত করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই চিন্তায় তাঁহার কয়েক মাস অতীত হইল, এবং তৎপর বহু চিন্তা এবং চেষ্টার ফলে নানারূপ কল কৌশল খাটাইয়া অবশেষে অতিশয় সাহসের সহিত চতুর্গুণ উৎসাহে অতিবড় কারবার ফাঁদিয়া বসিলেন। কিন্তু ফাঁদিয়া বসিলে কি হইবে, পতনের কারণ যে রহিয়াই গিয়াছে। তাহা বিদূরিত হইয়াছে কি?

যাহাই হউক, ভদ্রলোক নিঃসম্বল অবস্থায়ও অসাধারণ চিন্তা এবং চেষ্টার ফলে অবশেষে আবার লক্ষ টাকার এক কারবার ফাঁদিয়া বসিলেন। কল-কারখানা স্থাপিত হইতে লাগিল—

লোকজন নিযুক্ত হইল, আবার কাজকর্ম্ম চলিতে লাগিল ; গৃহিণী অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। টাকা পয়সাও আমদানী হইতে লাগিল, কাজকর্ম্ম প্রায় পুরাদমে চলিতে লাগিল। গৃহিণী আবার আশায় বুক বাঁধিয়া নীরব রহিলেন।

কিন্তু এরূপ স্ত্রীলোকের ধৈর্য্য কতক্ষণ থাকে ? অতি অল্প সময়। তাঁহারা মনে করিয়া থাকে যে "মিনিটে মানুষ" হওয়া যায়, "বিপলে বড় লোক হইতে পারে।" যদি তাহা না হয়, তবেই তাহাদের আর ধৈর্য্য থাকে না, তাহারা আর স্থির থাকিতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল, যখনই গৃহিণী দেখিলেন যে কয়েক দিন ধরিয়া টাকা পয়সা আর তেমন ভাবে আমদানী হইতেছে না, বিশেষতঃ পাওনাদারেরা আসিয়া তাগাদা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন গৃহিণী বলিয়া বসিলেন "এইরূপেই লোকে ব্যবসায় করিয়া থাকে ? লোকে আগে চাকরী করিয়া টাকা জমায়, তারপর যদি হয়, কারবার করে !" শুনিয়া ভদ্রলোকের মাথায় বজ্রাঘাত হইল! আবার অশান্তির সূচনা! ভাবী বিপদ চিত্র তৎক্ষণাৎ তড়িৎ-প্রবাহের ন্যায় চিত্রিত হইয়া গেল। তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি অবশেষে আপনাকে কুড়াইয়া লইয়া নানা উপায়ে স্ত্রীকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইলেন, অতি সহজে, অতি শীঘ্র টাকা আসিবে বলিলেন, কিন্তু গৃহিণী এক 'হুঁ'তে সব কাটাইয়া দিলেন। কারবারের যে অবস্থা হইবে, তিনি তাহা দিব্য চক্ষে তখনই দেখিতে পাইলেন, তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি বুকে হাত দিয়া বসিয়া নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

এই সময় আর একটী কথা বলা দরকার। এই কারবার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আর একটী দুঃসময়-পতিত ভদ্রলোককে স্বপরিবারে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। আপন কাজ কর্ম্ম গুছাইয়া এক সপ্তাহের মধ্যেই তাহাদের স্থানান্তরে যাওয়ার কথা। কিন্তু কার্য্যকালে তিনি সেরূপ করিতে পারিলেন না। সপ্তাহ কাটিয়া গেল, এক সপ্তাহের যায়গায় দুই সপ্তাহ হইল, তবুও তিনি কাজ গুছাইয়া উঠিতে পারিলেন না; তিনি তথায়ই থাকিতে লাগিলেন এবং এই স্থানে বসিয়াই তাঁহার কাজকর্ম্মের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এরূপ অবস্থায় থাকাতে পূর্ব্বকথিত ভদ্রলোকের যেরূপ যে অসুবিধা হইতেছিল, তাহা তিনি দেখিয়াও দেখিলেন না, অথবা দেখিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না।

এদিকে গৃহিণীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে, কাজে কাজেই তিনি এখন ভারী উন্মনা। কোনও কার্য্যে আর তাঁহার মন নাই (কাজও কিছু ছিল না), কেবল "এরূপে কারবার হইতে পারে না" এইরূপ কথা বলা কাজেই, মনকে নিয়োজিত করিলেন এবং মাঝে মাঝে সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া তিনি এবং অপর ভদ্রলোকটীর পরিবার, অতি সামান্য লোকদের স্ত্রীলোকেরা যেরূপ করিয়া থাকে, সেইরূপ মনোমালিন্য সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন ভদ্রলোক বাড়ীতে আসিলেই সেই ভদ্রলোকটী আসিয়া প্রথমে নালিশ রুজু করিতে আরম্ভ করিলেন, তৎপর কর্ত্তৃপক্ষের শুনানী হইতে লাগিল। এবং অবশেষে "এইরূপে কারবার হইতে পারে না" দিয়ে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ" করা হইত। ভদ্রলোক

লজ্জা, দুঃখ এবং রাগে অধীর হইয়া পড়িতেন, তখন আপন কারবারের চিন্তা করা অসম্ভব হইত। কিন্তু সমুদয় সম্পত্তি রক্ষা করার ভার তাঁহার এই চিন্তার উপরে! দিন দিন তিনি এইরূপে উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন। কিন্তু অশান্তি-অনল নির্ব্বাপিত করিতে পারিলেন না, তাহা হুহু করিয়া অবিরাম জ্বলিতেই লাগিল। এবং অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতা-বাতাস আসিয়া ইহার সহিত যোগদান করিয়া ইহাকে অতিশয় প্রবল করিয়া তুলিল। তিন মাসের মধ্যে ভদ্রলোকের এমন প্রাণপাত পরিশ্রমের ফল সমস্ত কারবার সমূলে ইহাতে ভস্মীভূত হইল। ভদ্রলোকের বুক ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন। গৃহিণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

কিন্তু তাঁহারই বা শান্তি কোথায়? তিনিই বা ইহাতে কিরূপে সুখী হইতে পারেন?—শান্তি পাইতে পারেন? কিন্তু বেজায় ভোগবিলাস-বাসনা, অতি উগ্র ইচ্ছা—যদি স্বামীকে কোনও রূপে উত্তেজিত করিয়া কোনও চাকরী লওয়াইতে পারেন, তবেই সাধ পূর্ণ হইবার পথ হইল। কিন্তু হৃতবুদ্ধি গৃহিণীর এ কথা এযাবৎ একবার ভাবিবারও ক্ষমতা হয় নাই, যে, তাঁহার স্বামী যে কারবার গঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যদি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, মাসিক আয় কত হইত? যে আয় হইত তাহার তুলনায় চাকরী করিলে তিনি যে মাহিনা আশা করিতে পারেন, তদপেক্ষা কম কি বেশী হইত? এবং তাহাতে বাসনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল কি না? কিন্তু হৃতবুদ্ধার এইটুকু

ভাবিয়া দেখিবার সময় হয় নাই; তিনি এইটুকু ভাবিয়া দেখিতে সক্ষম হন নাই। অমন শক্তিশালী উদ্যমী সিংহকে অন্যায় উৎপীড়ন করিয়াছেন। সর্ব্বস্ব শেষ করিয়াছেন। কিন্তু কি এক অজানিত কারণে তাঁহারও মনে দুঃখ হইয়াছে, তাঁহারও মন তিন দিন ধরিয়া কি এক আগুনে দগ্ধ হইতেছিল, তাই তৃতীয় দিনে তিনি বলিলেন, "আবার কি হয় না? মানুষে এক, দুই, তিনবার চেষ্টা করে, তুমি কি আর একবার চেষ্টা করিতে পার না? আবার কি হয় না?"

আচ্ছা, এখন জিজ্ঞাস্য এই—এই যে ভদ্র লোকটী দুইবার করিয়া কারবার ফেল করিলেন, ইহার মূল কারণ কি? স্ত্রীর অন্যায় রূপ চাকরী-প্রিয়তা নয় কি? যদি ভদ্রলোকের চিন্তার সময় অন্যায় কলহে আহ্বান করা না হইত, যদি ভদ্রলোক উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় কাজগুলি করিবার অবসর এবং সুযোগ পাইতেন, স্ত্রী যদি তাঁহাকে সামান্য মাত্র সহায়তা করিতেন, অথবা নেহাত পক্ষে যদি তিনি কেবল মাত্র স্বামীর সহিত একমত হইয়া স্বামীর কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইতেন, যদি কেবল মাত্র চাকরী চাকরী করিয়া অন্যায় অশান্তির সৃষ্টি না করিতেন, যদি ভদ্রলোক নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিবার সুবিধা পাইতেন, তবে কি এই দুইবার করিয়া তাঁহার কারবার ফেল পড়িতে পারিত? মাথায় টাকা দিবে, মানে মাথায় টাকা কোন্ কোন্ পথে আসিতে পারিবে তাহা দেখাইয়া দিবে, এবং তারপর অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই সমুদয় যোগাড় করিয়া আনিতে হইবে, তবে হইতে পারিবে।

কিন্তু সেই মাথা যদি সর্ব্বদা অন্যায় অশান্তি-অনলে দগ্ধ হইতে থাকে, তবে কিরূপে কি হওয়ার আশা করা যাইতে পারে? স্ত্রী যদি মাথার ব্যথা না বুঝে, স্ত্রী যদি স্বামী-সমীপে আত্মসমর্পণ না করে, স্ত্রী যদি স্বতন্ত্রমতাবলম্বিনী হয়, স্ত্রী যদি স্বামীর মনের ব্যথা দূর করিতে না পারে কিংবা না করে, স্ত্রী যদি সব সময় স্বামীর আরব্ধ কার্য্যের বিরুদ্ধচারিণী হয়, স্ত্রী যদি সব সময় স্বামীর কাজের সহায়তা না করে, স্ত্রী যদি ধৈর্য্যশালিনী না হয় ও সামান্য কারণে অসামান্য অশান্তি সৃষ্টি করে, বৃথা কথায় বৃথা কাজে স্বামীর মন নষ্ট করিতে কুণ্ঠিতা না হয়, এবং সর্ব্বশেষ বা সর্ব্বোপরি, স্বামী যেরূপ হ'ক, সুশ্রী বা সুরূপ অথবা কুশ্রী বা কদাকার হ'ক, পণ্ডিত বা মূর্খ হ'ক, প্রিয়দর্শন বা অপ্রিয়ভাজন হ'ক, যদি স্ত্রীর তাহার প্রতি "সে স্বামী, সোহাগের জিনিষ, আদরের সামগ্রী, ভালবাসার ভাণ্ড, ও ভক্তির পাত্র—পূজ্য" এইরূপ ভাব না থাকে, তবে সে সংসারে কোনও দিন উন্নতি হইতে পারে না। অন্য প্রিয়দর্শন পুরুষরত্ন যত কেন সুন্দর হউক না, যত কেন সে তোমার প্রতি সদ্ভাব দেখাক না, জানিও সে শত হইলেও তোমার পর, স্বামী নয়। তাহারও তোমার ন্যায় একটী সংসার আছে, সে তথায় আবদ্ধ; তারই সে আপন, তোমার নয়। তোমার আপন তোমার স্বামী। সুতরাং অল্পকালের জন্য প্রিয়দর্শনের দিব্য কান্তি দর্শনে মোহিত হইয়া, দু'টী মিষ্টি কথায় তুষ্ট হইয়া আত্মহারা হইও না। জানিও, সে হাজার প্রিয়দর্শন হউক, কিন্তু সে পরের, তোমার নয়। তোমার যদি স্বামিসোহাগ পাইতে হয়, যদি স্বামিসোহাগে

সুখী হইতে হয়, যদি স্বামীর ভালবাসাময় সংসারে স্বর্গলাভ করিতে হয়, যদি স্বামীর পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতে হয়, যদি স্বামীর পূজায় কোনও সুখ থাকে, তবে তাহা, তোমার ঐ ঘরের আপন স্বামীকেও পূজা করিয়া পাইবে। পরের প্রিয়দর্শন পূজিয়া কখনও সেই সুখ লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। মনে রাখিও, পর দ্বারা কখনও পরম গতি হয় না। মনে রাখিও, আপন আর পর।

'আপন আর পর বড় মস্ত কথা। আপন আর পরে অনেক তফাৎ। আমি হইতে আমার। কাজে কাজেই আমার যাহা তাহা অতি মিষ্টি। যাহার অথবা যে বস্তুরই পূর্ব্বে 'আমার' শব্দ সংযোজিত হয় তাহাই সুশ্রী সুমিষ্ট ও সুশ্রাব্য হইয়া দাঁড়ায়। যদি তাহা না হইত, তবে কুশ্রী কদাকার সন্তানকে লোকে লালন পালন করিত না, তাহা না হইলে কাণা খোঁড়া, কুঁজা কিংবা দরিদ্র স্বামী লইয়া সংসার করিত না। সকলেই প্রিয়দর্শনের পিছু পিছু ছুটিত। আর অপ্রিয়দর্শন সব কেবল মরিয়া ভূত হইয়া গাছে গাছে বিচরণ করিত। কিন্তু তাহাই করে কি? কুশ্রী কদাকার সন্তান কি মায়ে কখনও ফেলিয়া দেয়? খোঁড়ার স্ত্রী কি স্বামী ত্যাগ করে? অবশ্যই করে না, অন্ততঃ এ দেশে ত নয়। কেন? কারণ? কেন না, তাহাতে অকলঙ্ক 'আমার' কথাটী আছে। তাহাতে আমার (আমি এর) সম্বন্ধ রহিয়াছে। কেন না, এই অখণ্ড 'আমার' শব্দ সংযুক্ত রহিয়াছে। তাই কুশ্রী কদাকার সব সুশ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংসারে আমার যাহা—আপনার যাহা, তাহাই ভাল। পর নয়। আত্মসেবায় আত্মপ্রসাদ লাভ

করিতে সক্ষম হওয়া যায়, এই তাহাই সংসারে অতুলনীয় স্বর্গসুখ। কিন্তু পরের দ্বারা কিংবা পর হইতে কি আমরা কখনও সেই সুখ আশা করিতে পারি? পর যে পরের। পরের আপনাকে ভজনে তোমার কি সুখ হইতে পারে? পরের আপনা তোমার কথায় একটু সহানুভূতি দেখাইল, তাহাতে তোমার এমন কি লাভ হইল? তবে পরের আপনার নিকট আত্মকথা বলিয়া তাহার দু'টী মিষ্টি কথা শুনিয়া একটু সহানুভূতি লাভ করিয়া আপনার অমূল্য ধনকে অসুখী করিয়া নিজে অবিশ্বাসীনী হইয়া কি সুখ পাইবে? বরং আত্মপ্রসাদের পরিবর্ত্তে অন্তে অনন্ত নরকযন্ত্রণায় জ্বলিয়া মরিবে। তাহা তোমাদের পক্ষে কখনই সুখের নয়। এ কথা তোমাদের পরম হিতৈষী পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য ঋষিগণ তাঁহাদের দিব্য চক্ষে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাই এই সব সারগর্ভ উপদেশ শাস্ত্রাকারে রাখিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু আজ আর সে কাল নাই, এদেশের আর সে দিনও নাই। সে কালও গিয়াছে, এদেশের সে দিনও ফুরাইয়াছে। আছে কেবল উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাস, আর—সুমধুর স্মৃতি। আর আছে কি? আছে আমাদের অত্যাশ্চর্য্য অধঃপতন। আজ আমাদের শিক্ষাও নাই, সে সংযম নাই, সে সত্যনিষ্ঠা আচার নিয়মও নাই, আছে কেবল কতকগুলি কুসংস্কার। পরিণাম? আজ আমরা এই—পরপদানত, পরমুখাপেক্ষী, পরাধীন। আমরা আজ পরের আদর্শে গঠিত, পরের শিক্ষায় শিক্ষিত, নূতনভাবে অনুপ্রাণিত এবং নূতন সভ্যতালোকে আলোকিত। আমরা এখন আপনার

মধ্যে পর হইয়াছি। আর আমরা যেমন হইয়াছি, আমাদের ঘরও তেমনি পর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের গৃহলক্ষ্মীরাও তেমনই গাড়ীচড়া শিখিয়াছে। দোষ কি? দোষ নাই।

কিন্তু দুঃখ এই, এদিকে যে আর কুলায় না। দেবীরা গহনা, গাউন, সেমিজ, কামিজ, কোট, পেটিকোট, টুপি প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা হয় পরুন। দোষ কি? আরও বরং ভাল, হয়তো দেখাইবে ভাল। সাবান, সুবাসিত তৈল, সুগন্ধি জল, যাহা খুসী মাখুন না, তাহাতে আর আপত্তি কি? এ অতিশয় সুখের কথা, গন্ধে ঘর 'ম' 'ম' করিবে। গাড়ী ঘোড়ায় চড়িবে তাহাতেই বা হানি কি? এত আমাদেরই সুখবৃদ্ধির আয়োজন বা সূচনা। এ সব কিছু-তেই দোষ বা স্ত্রীলোকদিগকে দোষী মনে করি না; তাহারাও যে মানুষ, তাহাদেরও সুখ ভোগের বাসনা হইতে পারে। সুতরাং হউক। কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু কথা এই, ইহাতে যে টাকার দরকার! টাকা কোথায়? বঙ্গললনাগণ সুসজ্জিত ও সুশোভিত হইয়া সুখে সচ্ছন্দে বাস করেন এ কামনা কে না করে? কে বাঙ্গালী সে যে আপনার স্ত্রীকে বহুমূল্য বসন-ভূষণ ও রত্নালঙ্কারাদিতে সুসজ্জিত ও সুশোভিত করিতে না চাহে? কে তিনি যিনি এই গৃহপ্রতিমাকে নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্যে না সুবাসিত করিতে চাহেন? কে না চাহেন যে এমন পার্থিব প্রতিমা, সাধনার সামগ্রী ও সোহাগের ধনের গায়ে যেন একটু কালি-কণা না স্পর্শ করে? কিন্তু কয়জনে পারে। কেন পারে না? শক্তি কোথায়? টাকা কোথায়? টাকা যে বাড়ে না—আর যে বাড়ে না? যথেষ্ট অর্থ

আসে ত অভিলাষ বাড়ে। আয় বাড়ে তো যেমন ইচ্ছা ব্যয় করিতে আমোদ ও স্ফূর্ত্তি লাগে। কিন্তু অর্থই যে আসে না, আয় যে কিছুতেই আর বাড়িতেছে না; যেমন ঠিক তেমনই আছে। সেই জন্যই তো দুঃখ। তাহা না হইলে এদেশে বিশেষতঃ এ বাঙ্গালার স্ত্রীরত্নকে রত্নবিভূষিত ও রত্নালঙ্কৃত করিতে কে না চায় বা না সুখী হয়? কিন্তু প্রায় কেহই যে পারে না, কাহারও যে সে সুদিন হয় না, আয় যে বাড়ে না, এইত দুঃখ। আর ইহা যদি আমাদের বঙ্গলক্ষ্মীরা না বুঝেন এবং না বুঝিয়া অনবরত আমাদিগকে নানা প্রকারেই উৎপীড়িত করিতে থাকেন, তবে যে আমাদের দুঃখ আরও দশগুণ বাড়িতে চলে। কিন্তু এ পোড়াদেশে এখন আর তাহা কে বুঝে? কয়জন বুঝিতে চায়? সকলেই চায় আপন স্বার্থ, সকলেই বুঝে আপন স্বার্থ!

বিদেশী সভ্যতা এদেশে বিষম বানাইয়াছে। আমাদের মাথা তো যেরূপ করিয়া হউক খাইয়াছে। আজকাল আবার অন্দরমহলে মহাহুলস্থূল ফেলিয়াছে। সতীরা স্বামিগৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখে স্বামীর কোম্পানী কাগজ কত টাকার আছে? আর সম্পত্তিই বা কি আছে? স্বামী বীমা করিয়াছেন কি না? স্বামী এখন সংসার ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলে, তাহার ভালরূপ গতি বিধির ব্যবস্থা হইয়াছে কি না? না হইয়া থাকিলে, যত শীঘ্র সম্ভব তাঁহার কর্ত্তৃক তাহা করা যায় কি না? কি বিষম ব্যাপার! হা রে বেটী, এসেছিস্—দুদিন থাক্, স্বামীটা কি তাহা দেখ। আর তার পর, সেটা যাই থাক্ তাহার মন বুঝে তাঁহাকে

নিজের স্বামী করিয়ে নে, তাঁকে তোর দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী হইতে চেষ্টা কর, তাঁহার সংসারখানি সুন্দর ক'রে গ'ড়ে পিটে ঠিক ক'রে, নে, তার পর তাঁকে দিয়ে যথাসাধ্য যা খুসী তা করিয়ে নে! তাহা না করিয়া একি! কাজ না করিয়াই কাজের আদর! অল্প বয়সেই আখেরের খবর, এসব যে বড় বিষম! বেজায় বিট্‌কেল! এসব যে এদেশে একেবারে নূতন! একদম আনকোরা!

কিন্তু নূতন হইলে কি হয়? আনকথায় আশ্চর্য্য হইলে কি হইবে? আর বিট্‌কেলে বিমুখ হইলেই বা চলিবে কেন? এখন এসব চাই। আজ কালের বাজারই এই! বিষম হইলেও এইরূপই এখন সমান দেখিতে হইবে, বিট্‌কেল হইলেও এইরূপ এখন থাইতে হইবে। আর আশ্চর্য্য হইলেও এইরূপ এখন চালাইয়া লইতে হইবে। বঙ্গ-ললনারা আর এমন অধম অধীন হইয়া থাকিতে চায় না। তাহারা এখন নূতন সভ্যতা পাইয়াছে, নূতন শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়াছে, তাহারা এখন তাহাদের আপন বুঝ বুঝিতে বসিয়াছে। ইহাতে আপত্তি করিলে চলিবে কেন? তোমরা মরিয়া যাও, আর তোমাদের বিধবারা পথে বসিয়া কাঁদুক, এ তাহারা আর পছন্দ করে না। তোমরা আজ কাল তোমাদিগকে যেরূপ অল্পায়ু প্রমাণ করিতে বসিয়াছ, তাহারা তাহাতে স্বার্থ না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছে না। কারণ, তোমরা মরিয়া গেলেও স্বশরীরে তাহাদিগকে অনেক দিন এখানে থাকিতে হইবে। সুতরাং তাহারা স্বার্থ দেখিতে বসিয়াছে। ইহাতে তোমাদের আপত্তির কারণ কি হইতে পারে?

আপত্তির অবশ্য আর বেশী কোনও কারণ থাকিতে পারে না; তবে কয়েকটী কথা বলিবার ও জিজ্ঞাসা করিবার আছে। বর্ত্তমানে আমাদের আয় কম। আয় না বাড়িলে ব্যয় বৃদ্ধি করা অসম্ভব। আর পারা যায় না। কিন্তু সমগ্র বাংলাদেশের অবস্থার উন্নতি না হইলে, ব্যক্তিগত কিংবা শ্রেণীগত আয় বৃদ্ধিও হইতে পারিবে না। আর এই সমগ্র বাংলার উন্নতির জন্য বাংলার স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই সমানভাবে দায়ী। কেন না, আমরা পুরুষরাও যেমন বাংলার জল এবং বাঙ্গালার ফলে পরিপুষ্ট, তাহারাও তদ্রূপ। আর যদি তাহাই ঠিক, তবে দায়িত্বের বেলায় আমরা একা কেন? তাহারাও তাহা হইলে এদেশের উন্নতির জন্য অবশ্য দায়ী। যদি তাহাই হয়, তবে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাস্য এই, তাঁহারা বাংলার উন্নতিকল্পে কি করিয়াছেন এবং কি করিতেছেন? আমরা যে তাঁহাদের বাবুগিরির জন্য আমাদের আয়ের যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিব এবং আয়ের অকুলন হইলে, যদি সম্ভব হয়, তবে ধার করিয়াও বিলাসভোগের সামগ্রী করিতেছি বা করিব, তাহারা আমাদের সেই আয় বৃদ্ধিরই জন্য কতদূর কি করিতেছে বা করিতে প্রস্তুত আছে? তাহা করিতে যদি প্রস্তুত না থাকে, তবে তাহারা আমাদের কি? তবে কি তাহারা কবল মাত্র ভোগ বিলাসের পোষা পাখী—সুখের পায়রা! তাহা হইলে যে একেবারে পক্ষী বনিয়া গেলে! যদি তাহা হইতে আপত্তি নাই, তবে আবার "আমরাও মানুষ" এই কথা কেন? তাহা হইলে আবার মনুষ্যের অধিকারের দাবী কেন! পক্ষী হও তো যেমন খাঁচায় পারি তেমন খাচায় পুরিয়া যাহা পারি

খাওয়াইব। তাহাতে কোনও আপত্তি থাকিতে পারিবে না, কোনও অনুযোগ শুনা যাইবে না। অতিরিক্ত উপদ্রব করিলে উপযুক্ত প্রতিবিধান করা যাইবে। এবং করা উচিত। আর যদি 'আমরাও মানুষ' এই কথা বলিতে চাও, মানুষের সর্ব্ব প্রকার অধিকার লাভে অভিলাষ কর, তবে মানুষের ন্যায় সমান সমান কাজ করিতে হইবে। তাহা না হইলে কেবল "ভাগের বেলায় বড়টা; আর কাজের বেলায় কড়া ক্রান্তি!" এরূপ হইলে চলিবে না। মানুষ হইবে ত মানুষের মত কাজ কর, মানুষের অধিকার সবও ভোগ কর। তাহা না করিয়া কেবল যে কথা কহিবে, আর দাবী করিবে ও সব সময় কেবল অন্যায় অত্যাচার ও নানারূপে উৎপীড়ন করিবে, তাহা হইলে চলিবে কেন? কথা কহিবে তো কাজ কর, দাবী করিবে তো দায়িত্ব গ্রহণকর। তাহা না হইলে কেবল কতকগুলি বৃথা কথা বলিয়া কাজের ও অন্যায় অযৌক্তিক দাবী করিয়া অনর্থক অশান্তির সৃষ্টি করিয়া সংসারটীকে শ্মশানে পরিণত করিয়া কি লাভ?

আর এক কথা। আজ এ দেশের স্ত্রীলোকেরা যে দেশের সভ্যতার অনুকরণ করিতেছে, যে দেশের ভাবে অনুপ্রাণিতা হইয়া এ দেশী ভাব সমুদয়ের বিনাশ সাধন করিতেছে, ইহারা কি তাহাদেরই যথার্থরূপে অনুকরণ করিতেছে? ইহারা কি তাহাদের সংগুণগুলি গ্রহণ করিতেছে? তাহারা যেরূপ এবং যে যে কাজ করে, ইহারা সেরূপ এবং সেই সেই কাজ করিতে পারেন কি না? অন্ততঃ চেষ্টা করেন কি না? তাঁহারা সেরূপ পরিশ্রম করিতে

পারেন কি না? ইঁহারা সে সবগুলি কিছু অনুকরণ করেন কি না? না কি কেবল গায় ফুঁ দিয়া বেড়াইতে অথবা কেবল সাজিয়া গুঁজিয়া গল্প করারই অনুকরণ করিতেছেন? অভিজ্ঞতার বলে তাঁহারা কেবল শেষের গুলিরই অনুকরণ করিতেছেন। আগের গুলির অনুকরণ করিলে, এদেশে আজ এমন অশান্তি-অনল জ্বলিয়া উঠিত না। এদেশী সংসারগুলি এমন শ্মশানে পরিণত হইত না। এদেশী স্ত্রীলোকেরা যদি বাস্তবিকই বিদেশী স্ত্রীলোকদের যথাযথ অনুকরণ করিতেন, তাহা হইলে আজ এদিনেও এদেশের অবস্থা এমন থাকিত না। আজ এদেশে অনেক উন্নতি হইত, আজ আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিতাম। তাহা হইলে শিক্ষিতের সংখ্যা এদেশে আজ শতকরা পাঁচ জনের অনেক বেশী হইত। এদেশ আজ এমন দৈন্যদশায় পতিত থাকিত না।

ইউরোপীয়ান স্ত্রীলোকদিগকে এদেশীয় অনেক লোক অনেকরূপ আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া থাকেন ও তাঁহাদের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা ঠিক সেরূপ ভাবে কথিত হইবার যোগ্যা নহেন, অথবা সেরূপ নিন্দার পাত্রী নহেন। তাঁহারা সংসার গঠন করিবার জন্য যেরূপ বুক বাঁধিয়া খাটেন, সংসার রক্ষা করার জন্য যেরূপ অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার জন্য, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া কাজ করেন, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই প্রাণজুড়ায়। তাঁহাদের কার্য্যকালীন পরিশ্রান্ত প্রতিমূর্ত্তি খানি বাস্তবিক বড়ই নয়ন-প্রীতিকর। তথায় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক-

দিগকে গৃহ কর্ম্মের জন্য প্রায়ই অন্য লোক রাখিতে হয় না। গৃহিণীরাই স্বহস্তে সমস্ত কাজ করিয়া থাকেন এবং এ সমুদয় সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করিয়া যে সময় অবশিষ্ট থাকে তাহা সঙ্গীতশিক্ষা ও বাড়ীর জন্য হাট বাজারাদি করার জন্য ব্যয় করিয়া থাকে। এই হাট বাজার করার জন্য যখন তাহারা বাহিরে যায়, তখনই তাহারা দস্তর মত সাজ সজ্জা করিয়া যায়। কিন্তু ইহাকে বাস্তবিক সাজ সজ্জা বলা যায় না, কেন না, তাহারা সাধারণতঃই এইরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকে, ও কেবল আমাদের চক্ষেই ওরূপ দেখায়, নতুবা তাহাদের পক্ষে অতি সাধারণ।

ইউরোপীয়ান্ স্ত্রীলোকেরা সকলেই শিক্ষিতা, তাহারা সকলেই লিখিতে পড়িতে পারে। ইহাতে তাহাদের সন্তানেরা অতি সহজে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। সংসারের আয় ব্যয়ের হিসবাদি সচরাচর তাহারাই রাখিয়া থাকে, এবং এই জন্য তাহাদের স্বামীদিগকে কোনই বেগ পাইতে হয় না। এক কথায় বাড়ীর ভিতরের কাজ যাহা কিছু তাহা প্রায় সমুদয়ই তাহারাই করিয়া থাকেন। এই জন্য সংসারের সমস্ত অবস্থাই তাহারা সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকে, সুতরাং বৃথা আব্‌দার করিয়া স্বামীর অপ্রীতিভাজন হইতে প্রায়ই প্রয়াস পায় না, এবং ইহাতে সংসারে অযথা অশান্তিরও সৃষ্টি কমই হইতে পারে।

তার পর, সংসারের সমুদয় কাজ করিয়াও তাহারা নানা প্রকার পুস্তকাদি পাঠ করিয়া বাহিরের জ্ঞানলাভ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে ত্রুটী করে না। এতদ্ব্যতীত তাহারা নানারূপ সভা

সামাজিকতে যোগদান করিয়া নানা প্রকার সামাজিক ও জাতীয় উন্নতির সহায়তা করিতে বিরত থাকে না। তাহারা অতি সামান্য মাত্র সময়েরও অপব্যবহার করিতে কুণ্ঠিতা হয়। প্রত্যেকটী দিনের প্রত্যেকটী মিনিটের তাহারা সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে। অযথা আব্দার করিয়া বৃথা অশান্তি সৃষ্টি করিবার সময় তাহারা খুব কম পায়। এদেশী স্ত্রীলোকেরা যদি যথাযথ রূপে তাহাদের অনুকরণ করে, এদেশে তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সোনা ফলিতে পারে। কিন্তু এদেশী স্ত্রীলোকেরা তো তাহা করে না, ইহারা কেবল তাহাদের একটু মাত্র কাজের অনুকরণ করিতে যাইয়া অর্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া অনর্থ ঘটায়। যে টুকু ইহারা অনুকরণ করিতে চায় প্রকৃত প্রস্তাবে সেটুকুও ঠিক তেমন নয়। তাহারা ঠিক সেই অর্থ ধরিয়াই আছে, অন্যের যেরূপ অভিরুচি, বুঝিতেছে ও অনুকরণ করিতেছে। ইহাতে কি তাহাদেরই দোষ, না, অর্থ না বুঝিয়া যাহারা অনুকরণ করে তাহাদেরই দোষ? কাহার দোষ?

অবশেষে আরও একটী কথা বলিবার আছে। এদেশী স্ত্রীলোকদের অন্যদেশী স্ত্রীলোক, যাহাদের আচার ব্যবহার, কাজ কর্ম্ম ও সাজ সজ্জার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে অক্ষম তাহাদের অনুকরণ করিবার দরকারই বা কি আছে? যেদেশে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি সতীর চিত্র আজও বর্ত্তমান, তাহাদের আবার বিদেশে আদর্শের জন্য যাইবার কি দরকার? এখনও যাহাদের সম্মুখে এদেশী রাজপুত বালাদের কার্য্যকাহিনী বর্ণিত ও অভিনীত হইতেছে, তাহাদের আবার অন্যত্র যাইবার বা কি প্রয়োজন?

আসল কথাটা হইতেছে কাজ লইয়া। কাজ করিলে, এদেশে আদর্শের অভাব নাই। আদর্শের জন্য অন্যত্র যাইবার কোনও দরকার হয় না। আর তাহা না হইলে, কোন আদর্শই আমাদের দুঃখ দূর করিতে পারিবে না, বরং এইরূপ বিড়ম্বনারই সৃষ্টি করিবে।

তাহাই বলিতেছিলাম, আজ কাল আমাদের দেশী স্ত্রীলোকেরা যে নূতন সভ্যতা পাইয়া, নূতন শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া ও নূতন ভাবে অনুপ্রাণিতা হইয়া এদেশে ও এ সমাজে যেরূপ নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে, এ সবই ইউরোপীয়ান প্রথা। তাহারা এদেশ ছাড়িয়া আদর্শের জন্য অন্যত্র গিয়াছে। তাহা হইলে এদেশী আদর্শের দোহাইও আর খাটিবে না। আর অবশেষ, আমাদেরও আর এদেশে থাকিলে চলিবে না। এদেশে থাকিয়া বৃথা এদেশের শাস্ত্র কিংবা সতীদের দোহাই দিলে আর সংসার চলে না, আমাদেরও বিদেশী হওয়া দরকার, সংসার ও সমাজ রক্ষার্থে, এ দেশের হাওয়া পরিবর্ত্তনার্থে, বিদেশী হওয়া দরকার। তাহা না হইলে, মানে আমরা এখন বিদেশী না হইলে, নিকট ভবিষ্যতেই আমাদের সাংসারিক ও সমাজিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইবে যে তখন আর আমাদের পরিতাপ ভিন্ন প্রতিকারের সময় থাকিবে না।

কিন্তু সময় ছাড়িয়া দিয়া অসময়ে বৃথা পরিতাপ কিংবা অনুশোচনা করিলে তখন আর কোনও ফলোদয় হইবে না। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে প্রতিকারের ব্যবস্থা করাই বিধেয় বলিয়া বোধ হয়। অতএব বলি, আমাদেরও এখন বিদেশী হওয়া দরকার।

আমাদের দেশী স্ত্রীলোকেরা আ'জ কা'ল ইউরোপীয়ান সভ্যতালোকে উদ্ভাসিতা, ও নূতন শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া বিবাহের পরই, স্বামীকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন, বলিয়াই সর্ব্ববিষয়ে তাহাকে দায়ী করিয়া নানারূপ দাবী করিতে থাকেন ও নানা প্রকারে উৎপীড়িত করিতে থাকেন। "এটা দাও, ওটা দাও, সেটা দাও, আজ এটা না হইলে চলে না, কা'ল ওটা না হইলে ভাল মানায় না, সেদিন সেটা না হইলে অমুক বাড়ীতে দেখা করিতে যাওয়া যায় না," ইত্যাদি প্রকারে নিজেদের সংসারের অবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টি মাত্র না করিয়া কেবল ইচ্ছামাত্র অভিলষিত জিনিসের দাবী করিয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত পতিকে নিরন্তর প্রপীড়ন করিতে থাকেন। আর কোনও কারণে পতি এই সমুদয় ফরমাইসী জিনিষ না যোগাইতে পারিলে, অথবা কোনও কারণে সাধ পূর্ণ করিতে না পারিলে, নানারূপ বাক্যযন্ত্রণায় জর্জ্জরীভূত করিতে থাকেন। পতি ভ্রমেও যদি কোনও কিছু বলেন তবে "তোমার দিয়ে দরকার কি? তুমি না থাকিলে ক্ষতি কি? যাহারা বিধবা হয় তাহারা কি আর বাঁচে না? মর না কেন, আর কিছুই চাহিব না।" ইত্যাদি বলিয়া পতিকে পরিতুষ্ট করেন। আর স্বামী যদি শাসনের দিক্ দিয়া কিছু করেন তো স্বামি-সোহাগিনী একবারে ধলিয়া উঠিবেন "আমরা বুঝি আর মানুষ নই? আমাদের বুঝি আর বাসনা থাকিতে পারে না, কেমন?" ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া স্বামীকে তন্ময় করিয়া ফেলেন। কিন্তু তাহাদের ইচ্ছার অতিরিক্ত, কোনও কাজের কথা বলিলেই অমনি "লোক রাখিয়া দেও, আমি তোমার মাইনা করা ঝী কিংবা

চাকরাণী নই, আমি ওসব কাজ করিতে আসি নাই।” বলিয়া আপ্যায়িত করেন। আর স্বামীরা নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় নির্ব্বাক্ ও নিস্তব্ধ হইয়া অবস্থান করেন। বাংলার ভাব আজ কাল বাস্তবিকই এমনই। তাই বলিতেছিলাম, বাংলায় বর্ত্তমানে সংসার করা বড়ই সুকঠিন। একেত আয়ের অল্পতা, কোনও রূপ বৃদ্ধি নাই, তারপর আবার খাদ্য দ্রব্যের দুর্মূল্যতা। তদুপরি আবার এই অত্যাচার! কি বিষম ব্যাপার! এভাবে আর চলে কি করিয়া। লোকে এক মহাসমস্যায় পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা কি করিয়া বা উদরান্নের সংস্থান করিবে, আর কি করিয়াই বা কুল, মান ও সম্ভ্রম এসব রক্ষা করিবে!

এই ত গেল ব্যাপার, কিন্তু প্রতীকারের ব্যবস্থা কি? প্রিয়তমার পরিতুষ্টির জন্য কি প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে? না আর কোনও প্রতিবিধান আছে যদ্দ্বারা বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থার কোনওরূপ পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে?

প্রতীকার কি?

হাওয়া দেখা যাইতেছে সবদিকেই সমানভাবে প্রবাহিত; দেশ বিদেশে একই হাওয়া একই ধুয়া। উদাহরণের অভাব নাই, তবে উপায় কি? বর্ত্তমান বাঙ্গালার বঙ্গীয়া লেখিকারা যা কিছু কহিবার বা করিবার বেলায় সভ্যসমাজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেন, আর তাহাতে যদি একটু এদিক্ ওদিক্ হয় তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের অবনত নয়ন উন্নত করিয়া অঙ্গুলি প্রদর্শনে সাগরের ওপার দেখাইয়া

দেন। আজকাল আর সেতু কিংবা সাগর-যানের প্রয়োজন হয় না, কেবল কষ্টে সৃষ্টে একবার মনে করিতে পারিলেই হইল। এদিক্ দিয়ে প্রতীকার ত এই পর্য্যন্ত ; তবে আজকাল একটা নূতন বাতাস বহিবার উপক্রম হইয়াছে, অনেকেই আজকাল উচ্চ শিক্ষা, নিম্ন শিক্ষার অবতারণা করার পর অবসন্ন হইয়া অবশেষে এই অপোগণ্ড দেশের দিকে ফিরিয়া তাকাইতেছেন। এইবার সেকালের শিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের দিকে আস্তে আস্তে ক্ষীণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। এইখানে একটুমাত্র আশার অঙ্কুর দেখা দিতেছে বলিয়া বোধ হয়। কেন না, এদেশের পক্ষে এদেশীয় দৃষ্টান্তই কেবলমাত্র মানানসই হয় ও খাটে। বাহিরের আলোকে ক্ষণকালের জন্য আলোকিত বা চমকিত করিতে পারে, কিন্তু সেই আলোক আমাদের এদেশীয় লোকের পক্ষে প্রাণের আলোক বাড়াইতে পারে না। তাই বলিতেছি, এদেশে কেবল এদেশীয় দৃষ্টান্ত খাটে। আর এদেশীয় লোকের পক্ষে এদেশীয় দৃষ্টান্তই উপযোগী এবং উপকারী।

যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে এই সংসার-সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে একমাত্র শিক্ষাই যাহা কিছু করিতে পারে। অতএব শিক্ষা যাহাতে প্রসারতা লাভ করিতে পারে, তাহাই বর্ত্তমানে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু, শিক্ষার প্রসারণও দেখাযাইতেছে যে এখানেও বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "সে রাম নাই, সে অযোধ্যাও নাই।" শিক্ষা দিতে হইলেই আমাদের গৃহলক্ষ্মীদিগকে বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিতা করিতে হয়, কিন্তু যত আপদ্ বিপদের গোড়াও

ওইখানে। তবে ভরসা এই কাঁটাই কাঁটা তুলিতে সক্ষম। কাঁটা যখন বিঁধিয়াছে তখন কাঁটা ছাড়া কাঁটা তুলিবার আর অন্য উপায় কি? সুতরাং যেমনি হো'ক, যেদেশী শিক্ষাই হউক, শিক্ষা দিতেই হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজকাল

"অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী"

হইয়া দাঁড়াইতে দেখা যাইতেছে, একটী আধুনিক লেখিকার কথায় অধিকাংশ শিক্ষিতা ললনাগণই যে অল্পশিক্ষা-কারাগারের বদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া মানসিক স্বাস্থ্য সম্পাদন করিতে পারিতেছেন না,—শুধু তাই নয়, অনেক—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা অনর্থ ঘটাইতেছেন তাহাতে আর কোনও ভুল নাই। আগেকার আর্য্য-নারীগণ যদিও আজকাল অশিক্ষিতা বলিয়া কথিতা হইতে পারেন, এবং হইতেও পারে তাঁহারা সচরাচর বড় একটা লিখিতে পড়িতে পারিতেন না, কিংবা পারিলেও তাহা অতি সামান্য, কিন্তু তাহারা পিতৃ-সংসারে মায়ের আঁচলের আড়ালে সংসারধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রয়োজনীয় গুণগুলি প্রীতির সহিত শিক্ষা করিতেন, অথবা শৈশবে কিংবা বিবাহ হইলে স্বামীর নিকট স্বামীর শিক্ষা, দীক্ষা এবং স্বভাবানুযায়ী আপনাকে শিক্ষিতা করিয়া সংসারের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন এবং সংসারের সকলকে সুখী করিতেন। তাঁহারা লিখিতে পড়িতে না জানিলেও তাঁহাদের ভিতর সৎ-শিক্ষার অভাব পরিলক্ষিত হইত না। তাঁহারা লিখিতে পড়িতে না শিখিলেও

সদ্‌গুণগুলি বেশ করিয়া শিখিতেন। সুতরাং তখন এদেশী সংসার-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দিন অতিশয় সুখে শান্তিতেই কাটিয়া যাইত। কিন্তু আজকাল লিখিতে পড়িতে জানিলেও, সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহার্থে প্রয়োজনীয় সদ্‌গুণগুলি শিক্ষার অভাবে, কেবলমাত্র নাটক নভেলী বিদ্যায় মহিলাদিগকে সারশূন্য খোলস্—গন্ধবিহীন পলাশ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা দুই চারিখানা পুস্তক পাঠ করিয়াই স্বাধীনতার দাবী করিতে এবং স্বাবলম্বী হইতে প্রয়াসী হয়েন, এবং যা' তা' কিছু লিখিয়া ও বলিয়া এবং পূর্ব্ববর্ত্ত শাস্ত্রকারদিগের সমালোচনা করিয়া আপনাদিগের অসারতার পরিচয় দিয়া থাকেন এবং

"স্ত্রী-শিক্ষা প্রলয়ঙ্করী"

এই বাক্যের সত্যতা সপ্রমাণ করিয়া থাকেন। ভারত-মহিলারা কোনও কালে, আজকালের শিক্ষিতারা যেরূপ মনে করেন, সেরূপ পরাধীনা ছিলেন না, আজও তাঁহারা সেরূপ নহেন। শাস্ত্রকার যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—মনু যেরূপ আদেশ কিংবা উপদেশ দিয়াছেন, তদ্দ্বারা ভারতমহিলাগণের উপর রুলজারি করার মত কিছুই করেন নাই, স্বভাবতঃই যাহা হইয়া থাকে এবং চিরদিনই যেরূপ হইয়া আসিতেছে—যাহা প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া বুঝা যায় এবং ভগবানের নিয়ম বলিয়া অনুমিত হয়, তাঁহারা তদ্দৃষ্টে তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। সে সমুদয় ভারত-ললনাগণের উপরে ভারত-বর্ষের শাস্ত্রকারগণের রুলজারি করা নয়, ইহা তাঁহাদের বহু শ্রমসাধ্য—অনেক আয়াসলব্ধ—অভিজ্ঞতার ফল। তাঁহারা যুগ-

যুগান্তর অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকৃতিকে পাঠ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া গিয়াছেন, উপদেশের জন্য তাহাই তাঁহারা আমাদের জন্য লিখিয়া রাখিয়াগিয়াছেন। সে সমুদয় কোনওরূপ হুকুমজারি নয়। যে কোনও দেশে বিবাহান্তে স্ত্রীলোক স্বামীর অধীন থাকেন না কি? এবং তাঁহার ভরণ-পোষণের জন্য যাহা কিছু দরকার তাহা কি স্বামীই করিয়া থাকে না? তখন কি স্ত্রী স্বাবলম্বিনী হইতে যাইয়া থাকেন? না, হইতে চাহেন? না, প্রকৃতির নিয়মে গঠিত ও প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত তাঁহার দেহখানি দ্বারা সময় বিশেষে তাহা সম্ভব হয়? তাহা হয় না, কখনও তাঁহারা তাহা করেনও না, করিতে সক্ষমও নন এবং যে পর্য্যন্ত তাঁহারা স্ত্রীলোক থাকিবেন, যে পর্য্যন্ত না ভগবান্ তাঁহাদের শারীরিক পরিবর্ত্তনের কোনও একটা বিধান করিবেন, ততদিন কখনও পারিবেন না। ইহা ধ্রুব সত্য, ইহা বিধির বিধান, মানুষের করণ নহে।

তার পর "বিবাহের পূর্ব্বে নারীগণ পিতৃ-সংসারে পিতার অধীনে অথবা পিতার অভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অথবা অন্য কোনও অভিভাবকের অধীনে বাস করিবে," শাস্ত্রকারগণ এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। তাঁহারা যে এইরূপ আদেশ করিয়াছেন বা উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহারা তাঁহাদের প্রতি কোনওরূপ হুকুমজারি করিয়াছেন এরূপ বলা যায় না। কারণ, শৈশব, বাল্য বা কৈশোর বয়সে যখন তাঁহারা কোনও কার্য্যসম্পাদনে অক্ষম—অসমর্থ—যখন তাঁহারা আপনারটা আপনি করিয়া খাইতে অপারগ, তখন পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি অভিভাবকের অধীনেই অবস্থান করিয়া

থাকেন এবং তাঁহারাই লালন পালন ও ভরণপোষণাদি করিয়া থাকেন। মানব-সমাজে বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তনের মূলেও এই কারণই পরিলক্ষিত হয় এবং তাহা ছাড়া আর অন্য বিশেষ কোনও কারণ দেখা যায় না। মানবগণ অন্য জীব জন্তুর ন্যায় জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতেই কর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না, তাহারা কোনও কোনও জন্তুর মত, এমন কি, নিকট ভবিষ্যতেও হইতে পারে না। কাজে কাজেই তাহাদের প্রতিপালন করা এবং শিক্ষা দেওয়ার ভার আর কাহাকেও গ্রহণ করিতে হয় এবং সেই ভার পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি অথবা তদভাবে অন্য কেহ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিপালন ও ভরণ-পোষণাদি করিয়া থাকেন এবং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ উপযোগী শিক্ষাদি দিয়া সাধ্যানুরূপ সদ্‌গুণাদিতে সন্তান-দিগকে বিভূষিত করিয়া থাকেন। ইহা সর্ব্বদাই সর্ব্বত্রই হইয়া আসিতেছে ও হইবে। ইহা ছাড়া মানব-শিশুরা বাঁচিতে পারে না; আর যদিও বাঁচে, শিক্ষার অভাবে তাহারা স্বাধীন-ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী জানোয়ার ভিন্ন আর কিছুই, প্রায়ই হইতে পারে না। অতএব তাহাদের অপারগ অবস্থায় বিবাহপদ্ধতির সাহায্যে তাহারা যে কোনও একজন নির্দ্দিষ্ট অভিভাবকের অধীনে অবস্থিত হইয়া থাকে। এ শুধু মেয়েদের পক্ষে নয়, ছেলেদের পক্ষেও বটে। ইহা মানুষে মানুষের উপর জুলজারি করা নয়, এ ভগবানের মা'র—প্রাকৃতিক বিধান। মানুষ অপারগ অবস্থায় বাধ্য হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণ প্রকৃতির এই প্রকৃষ্ট নীতি দেখিয়া, বুঝিয়া তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। কোনওরূপ জুলজারি করেন নাই।

সর্ব্বশেষে “বিবাহান্তে স্বামী অভাবে অথবা অবর্ত্তমানে নারী উপার্জ্জনক্ষম পুত্র থাকিলে তাহার অধীনে, আর তদভাবে দেবর, ভাসুর, শ্বশুর, অথবা পিতা, ভ্রাতা কিংবা অন্য কোনও অভিভাবকের নিকট অবস্থান করিবে,” এইরূপ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই স্থানটা নবীনাদিগের পক্ষে একটু কড়া আইন বলিয়া মনে হইতে পারে, এবং ইহাও ঠিক যে এদেশে বিধবাদিগের জীবন বহন করা যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহাতেও কোনও ভুল নাই। তাহাদের দুর্ব্বিসহ বৈধব্য যন্ত্রণার বিষয় ভাবিতেও ভয় হয়, এবং তাহাদের করুণ ক্রন্দন-ধ্বনিতে পাষাণ হৃদয়ও আর্দ্র হয়। তাহাদের ঘন উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাস বাস্তবিকই বড়ই মর্ম্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক। আর তাহার উপর আবার পরের সংসারে অভিভাবক অভিভাবিকাদের বাক্য-যন্ত্রণা আরও ভীষণ। এমতাবস্থায় দেখা যায় তাহারা কোনওরূপ শিল্পকার্য্যাদি শিক্ষা করিয়া যদি দরকার হয় তবে তাহার সাহায্যে স্বাবলম্বিনী হইয়া স্বতন্ত্র বাস করিতে পারেন, এরূপ ব্যবস্থা না করিয়া “কাটা ঘায়ে আবার লবণের” ব্যবস্থা কেন করিলেন? স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিবার ব্যবস্থা করিলে কি ভাল হইত না? নিয়মটা যথার্থই এখানে বড়ই কড়া বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কথা এই সর্ব্বাবস্থায়ই দেশ, কাল, এবং পাত্র, এসব বিবেচনা করিতে হইবে এবং বিধির বিধানও মানিয়া চলিতে হইবে। আমাদের এই দেশে সতীদের সম্মান পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা অধিক; সতীত্বের আদর, এদেশীয় ললনামাত্রেই, কম আর বেশী, করিয়া থাকেন। এদেশী লোক মাত্রেরই ইহা, বলা বাহুল্য, বাঞ্ছনীয়। কিন্তু

পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক বিধানে ললনাগণ পুরুষদিগের চেয়ে হীনবল। কাজেকাজেই সতীদের সতীত্বের মর্য্যাদা বজায় রাখিবার পক্ষে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, কিংবা অন্য কোনও উপযুক্ত অভিভাবকের অধীনে অবস্থান করাই উচিত বলিয়া অনুমিত হয় এবং এযাবৎকাল সেইরূপই হইয়া আসিতেছে। অবলা, অনাথা, যুবতী বিধবা যদি স্বাধীনভাবে অবস্থান করিতে থাকে, তবে যে স্বেচ্ছাচারিতা আসিয়া তাহাদের মধ্যে প্রবেশ না করিবে তাহাই বা কে বলিবে? তাহারাও ত মানুষ, রক্ত-মাংসের শরীর ত বটে। হওয়াই কি সম্ভাবনা নয়? এবং হইলে কি স্বাধীনতার অসৎ ব্যবহার করা হইল না? স্বাধীনতার সেরূপ ব্যবহার কি সুখের হইবে? সেইরূপ কি কেহ চায়? চাওয়া দূরের কথা, কেহ কি ধারণাও করিতে পারে? না; আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, না। অন্ততঃ ভারতবাসী বাঙ্গালী কেহই তাহা চায় না। কে ভারতবাসী—বাঙ্গালী ভ্রমেও কখন ভাবিতে কিংবা দেখিতে পারে যে তাহার ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া, ভাগিনেয়ী অথবা যে কোনও একজন আত্মীয়া স্বেচ্ছাচারিতায় নিমগ্ন হয়? এখনও এদেশ ততটা অধঃপতিত হয় নাই।

যাহাই হউক, শাস্ত্রকারগণ অনেককাল যাবৎ দেখিয়া ভাবিয়া এবং বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহাই তাঁহারা লিখিয়াগিয়াছেন, বহু দিন ধরিয়াই এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। তাঁহাদের উপদেশ লোকে মানিয়া লইতেছে। তাঁহাদের এই আদেশ বা উপদেশবাণী, যখন এদেশবাসী যুবক-যুবতীরা

সংযমী ও উন্নত আর্য্যশিক্ষায় শিক্ষিত ছিল তখন মানিয়া চলিয়াছে এবং এযাবৎ কালও মানিয়া চলিতেছে। আর আজ এই দুর্দ্দিনে, যখন যুবক যুবতীরা সংযম কাহাকে বলে জানে না, সুশিক্ষার ধার ধারে না এবং কেবল মাত্র কয়েকখানা নাটক নভেলের পাতা উল্টাইয়া শিক্ষিতাদের খাতায় নাম লিখাইয়াছেন, আর কয়েকটী কবিতা লিখিয়া কবিত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, যাঁহারা আপনার মঙ্গল কি বুঝিতে সক্ষম নন, যাঁহারা স্বাধীনতা কি জানেন না, যাঁহারা স্বাধীনতায় স্বেচ্ছাচারিতার ফল ফলাইতে চাহেন, তাঁহাদের সময়ে সেই আর্য্য ঋষিদের উপদেশ-বাক্যগুলি যে সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয় তাহাতে ত কোন ভুলই নাই। যাঁহারা কখন সৎশিক্ষা পান নাই, যাঁহাদের পিতা মাতা তাঁহাদিগকে সুশিক্ষা দিবার কোনরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কেবলমাত্র কয়েক দিন বালিকা-বিদ্যালয়ের খাতায় নাম লিখাইয়া দিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, যাহারা সংযম কি কখন জানে না, যাহাদের চরিত্র গঠন হইবার সুযোগ হইয়া উঠে নাই, যাঁহারা সকাল হইতেই স্বেচ্ছাচারিতায়, অনুপ্রাণিতা তাঁহারাই স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যগ্র হইতে পারেন, শাস্ত্রকারদের শাস্ত্র তাঁহাদের নিকট কড়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু যাহারা সৎশিক্ষা লাভের সুযোগ পাইয়াছে, যাহারা কতক পরিমাণে সংযম শিক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে, যাহারা সামান্যরূপও আত্মচরিত্র গঠন করিবার সুযোগ পাইয়াছে, যাহারা স্বেচ্ছাচারিণী নয়, তাহারাই বুঝিবে তাহারা পরাধীনা নয় তাহারাও স্বাধীনা, পুরুষরা তাহাদিগকে

পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী করিয়া রাখে নাই, তাহাদের জগতে তাহারা মুক্ত—স্বাধীন এবং সংসারে সর্ব্বপ্রকার অধিকারই তাহাদের আছে। তাহারা অনুভব করিতে পারে, বুঝিতে পারে, শাস্ত্রকারদের শাস্ত্র তাহাদের উপরে হুকুমজারি নয়, ইহা আর্য্য ঋষিদের বহু আয়াস-সাধ্য অভিজ্ঞতাপ্রসূত উপদেশবাণী মাত্র। ইহাতে আদেশ নাই, প্রাকৃতিক জগতে প্রকৃতির নিয়মে যাহা প্রকৃত পক্ষেই আছে, এ সমুদয় তাহাইমাত্র। বালিকার বিবাহের পূর্ব্বে অপ্রাপ্তবয়সে অক্ষম অবস্থায়, তখন বিধিনিয়োজিত পিতা, মাতা, ভ্রাতা কিংবা অন্য কোন অভিভাবকের দ্বারা প্রতিপালিত না হইলে কিরূপে বালিকা বাঁচিতে পারে, আর কিরূপেই বা সুমধুর যৌবনসীমায় পৌছিতে পারে? পারে না, থাকে না; তাহাদের মঙ্গলার্থে যে কেহ একজন আপনার অধীনে রাখিয়া প্রতিপালন করে, স্বাধীনতাপূর্ণ সুমধুর যৌবন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়—বিধির এ বিধান চিরকালই এইরূপ, শাস্ত্রকার এই কথাটী লিখিয়া গিয়াছেন মাত্র। এ বিধির বিধান তার দোষ কি? তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, দেখিয়াছেন, তোমার ভবিষ্যৎ উপকারার্থে উপদেশচ্ছলে লিখিয়া গিয়াছেন। বড়ই অন্যায়, কেমন?

তারপর, বিবাহান্তে তোমরা কে কবে স্বামী হইতে স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতে ভালবাসিয়া থাক। কেহই পারে না, থাকেও না। যদি তাহাই পারিত কিংবা থাকিত, অথবা হইতে পারিত, তাহা হইলে আর বিবাহের প্রয়োজন ছিল না। এরূপ কখন হয় না, হয় নাই, হয় না, হইবেও না। বিবাহান্তে স্ত্রীলোকেরা স্বামীর

অধীনে অবস্থান করিয়া আসিতেছে ও আসিবে। পণ্ডিতগণ তাঁহাদের দূরদৃষ্টির সাহায্যে তাহা বেশ ভাল করিয়া দেখিতে পাইয়াছেন এবং লিখিয়া গিয়াছেন ; ইহাতে তাঁহাদের পাপ ? যাহা চিরদিনই হইয়া আসিতেছে এবং হইতেছে বা হইবে, সেই প্রকৃতির নিয়ম তাহারা দেখিয়া বুঝিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে কি অন্যায়! শাস্ত্রকারের ইহাতে কোন পাপ হইতে পারে ? তোমরাও যদি তোমাদের আজ-কালের নূতন শিক্ষায় তাহা বুঝিতে না পার, তবে কি সে তোমাদের দোষ, না তাঁহাদের দোষ ?

কথাটা কি, স্বাধীনতা বলিয়া ব্যগ্র হইলেত চলিবে না, বিষয়টা কি ভাল করিয়া বোধগম্য করিতে হইবে, শুধু চঞ্চল হইয়া চেঁচাইলে হইবে না। তোমরা কি, তোমাদের স্থান কোথায়, প্রাকৃতিক নিয়মে তোমাদের অধিকার কি, প্রকৃতির আজ্ঞায় তোমাদের কর্ত্তব্য কি, ভগবানের বিধানে তোমাদের স্বাধীনতা কি, স্বাধীনতা কোথায়, তাহা একবার ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিতে হইবে। কেবলই নূতন হাওয়া গায়ে লাগা'তে নূতন ভাব প্রাণে প্রবেশ করা'তে, যা' তা' বলিলে চলিবে না। তোমার অফিস তুমি বুঝিয়া লও, তোমার কাজকর্ম্ম তুমি পৃথক্ করিয়া লও, তোমার সংসারের সংজ্ঞাগুলি স্বতন্ত্র করিয়া দেখ, কে তোমাকে পরাধীন করিয়াছে ? দেখ তুমি পরাধীন কিনা ? দেখিতে পাইবে তুমিও স্বাধীন, তোমারও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, কেউ তোমার স্বাধীনতা হরণ করে নাই। বৃথা অন্যায় অত্যাচার, মিছামিছি দাবী, অকারণ উৎপীড়ন করিও না। অনধিকারচর্চ্চা, অন্যায় দাবী

করিলে প্রতিপদেই তোমাকে তুমি পরাধীন ও পরপ্রত্যাশী দেখিতে পাইবে।

তারপরে শিক্ষার কথা। সৎ শিক্ষা—উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিতে কে তোমাকে মানা করিতেছে? উচ্চ শিক্ষিত ত দূরের কথা, সামান্য শিক্ষিত সাধারণ লোকও তোমার শিক্ষায় অপক্ষপাতী নয়। লেখা পড়া শিখিবে? শেখ না! পড়াশুনা করিবে? যত ইচ্ছা পড় না! বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানলাভ করিবে? করনা! সেত ভাল কথা,—সুখের বিষয়; এ সুখে কে অসুখী? তবে কথা কি—অসুখের বিষয়টা কি যে তোমরা গোড়ায় গোবর দাও। আপন অফিস—আপন কর্ম্ম—আপনার ধর্ম্ম ও মোক্ষ বজায় রাখিয়া—যাহা কিছু সব বজায় রাখিয়া বল ইহাই বক্তব্য। ইহা হইলেই কেউ তোমাকে কিছু বলিবে না—কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না এবং তুমিও দেখিতে পাইবে তুমি স্বাধীন, পরাধীন নও, পুরুষেরা যেরূপ এজগৎকে উপভোগ করিতেছে, তোমরাও সেইরূপ করিতেছ।

আজ কাল অনেক শিক্ষিতা মহিলারা, অনেক জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা স্ত্রীলোক উচ্চশিক্ষার অপক্ষপাতী বলিয়া অনুযোগ করিয়া থাকেন। জানিনা, কোন "জ্ঞানবান্" ভদ্রলোক যে কাহারও উচ্চ শিক্ষার আপত্তি করিতে পারেন। বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানলাভাকাঙ্ক্ষীর জ্ঞান অর্জ্জন করিতে অনুমতি দিতে অরাজি বিষয়টা কেমন বলিয়া বোধ হয়। তবে হইতেও পারে। মুনিদেরও ত মতিভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের ধারণা সেরূপ নয়, সম্পূর্ণ অন্য রকমের। লেখা পড়া শেখ,

আপন বুঝিয়া চল, যতপ্রকার দর্শন বিজ্ঞানাদি চর্চ্চা করিয়া নানাপ্রকার জ্ঞান গবেষণায় সময় অতিবাহিত কর, সেত অতিশয় সুখের বিষয়। তদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আর, তাহা হইলে যে আমরা বাঁচিয়া যাই। ঘরে বাহিরে সমান শিক্ষা এযে বড় সুখের বিষয়। হয় না তাইতো দুঃখ। কিন্তু যদি হইতে পারে, তবে তাহার মত আর সুখ কি? হইলে যে আমাদের বোঝা অনেক হাল্কা হইয়া যায়—বোঝা যে একবারে আধা-আধি হইয়া যায়। সে সময় যেদিন আসিবে, সে দিন আমরা মহাসুখী হইব! সেটা যে ভারতবর্ষের একটা প্রার্থিত সময়? আমরা যে তাহাই চাই, সেই সময়েরই প্রার্থনা করি। আর সেই দিন পাইতেও কোন জ্ঞানবানের আপত্তি থাকিতে পারে? আমার তো নাই।

কিন্তু একটী কথা বলিবার আছে। বিজ্ঞানাদি চর্চ্চা করিয়া স্ত্রীলোকেরা জ্ঞানলাভ করিয়া প্রকৃতির প্রাকৃতিক তত্ত্ব অবগত হইয়া অপার আনন্দ উপভোগ করুক, কোনওরূপ আপত্তির কারণ নাই, বরং বিশেষ সুখের বিষয়। কিন্তু উপদেশ কিংবা উদাহরণ পাইতে হইলেই যে বিদেশে বিচরণ করিতে হইবে, তাহার মানে কি? এবং তাই যে যায়, সেই তো দুঃখের কথা। মনে রাখিতে হইবে এদেশের তুলনা কেবল এদেশেরই সঙ্গে খাটে। এ দেশ বাসীর পক্ষে এদেশী শিক্ষাই কেবল সুফল প্রদায়িনী। এদেশী লোকের পক্ষে কেবল এদেশী উদাহরণই অধিক উপযোগী। আর বিশেষ এদেশে কি উদাহরণ যোগ্যা স্ত্রীলোকের অভাব? গার্গী, মৈত্রেয়ী,

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা ও পদ্মিনী, অহল্যাবাই প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া নারীদের চিত্র কি উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত আদর্শ নয়? দেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইবার দরকার কি? এদেশের তুলনা যে কেবল এদেশের সঙ্গে খাটে, এদেশীয় লোকদের আদর্শ যে অন্য দেশে পাওয়া অসম্ভব, অসম্ভবকে সম্ভব করাও যে অসম্ভব,—এবং চেষ্টা পাইলে সততই অন্যায় ফল ফলিয়া থাকে, এদেশের তুলনা যে শুধু এদেশের সঙ্গেই হয়। তাই বলি, যদি শিখিতে পড়িতে এবং তজ্জন্য আদর্শ লইতে হয়, তবে এদেশেরই শিক্ষায় শিক্ষিতা হওয়া উচিত, এদেশেরই ভাবে অনুপ্রাণিতা হওয়া দরকার এবং এদেশীয় আদর্শই উচ্চে ধারণ করিয়া যতটুকু সম্ভব তাহাদেরই অনুকরণ অথবা অনুসরণ করা উচিত। সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি চরিত্রগুলি এক এক করিয়া প্রত্যেকটী পরীক্ষা করিয়া দেখ, তুমি কাহার মত হইতে চাও, কাহাকে তুমি আদর্শপ্রতিমারূপে সম্মুখে রাখিয়া তাহারই ভাবে আপনাকে অনুপ্রাণিতা করিয়া, তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে পার। দেখ, ইহার প্রত্যেকটীতে কি অপূর্ব্ব শক্তি, কি অপূর্ব্ব ভাব, কি অপূর্ব্ব শিক্ষা এবং একাধারে স্বাধীন এবং পরাধীনতার কি অপূর্ব্ব সম্মিলন!

সীতা।

রাজর্ষি জনক-নন্দিনী সীতা হরধনুভঙ্গকারী অযোধ্যারাজকুমার শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বিবাহিতা হইয়া রাজসুখভোগ

উপেক্ষা করত সতত পতিসেবা-সুখে বাঞ্চতা না হওয়ার জন্য পিতৃসত্য পালন করিতে প্রস্তুত শ্রীরামচন্দ্রের সহিত কণ্টকাকীর্ণ পথে পায়ে হাঁটিয়া শ্বাপদশঙ্কুল বনে গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। স্বামিসঙ্গে কেবল ফলমূলাহারে বহুদিন বনবাস করিয়া অবশেষে ভাগ্যদোষে বা বিধাতৃ-বিধানে লঙ্কাধিপতি রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হইয়া লঙ্কায় আনীতা হইলেন এবং রাবণ কর্তৃক রাবণরচিত অশোক বনে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় লঙ্কাধিপ-নিযুক্ত চেড়ীগণের কত অন্যায় ব্যবহার, কতরূপ অন্যায় অত্যাচার এবং অবিচার ও অত্যাচার কত কিছু সহ্য করিলেন। দশানন অবশেষে দশাননে কতরূপ প্রলোভন বাক্যে তাঁহাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন, কতরূপ প্রলোভনে পরিতুষ্টা করিতে চেষ্টা করিলেন, আরও কত অন্যায় অত্যাচার ও বলপ্রয়োগের ভয় দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু সীতা অচল অটল ভাবে অবিচলিতচিত্তে কেবল শ্রীরামের চরণ চিন্তা করিয়া শেষ সমস্ত সহ্য করিয়া শ্রীরামের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন এবং কল্পনায় নিমীলিত নেত্রে উদ্দেশ্যে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। সীতা যেন তখন আর এ জগতে ছিলেন না। রাবণের এবম্বিধ ভয় প্রদর্শন কিংবা প্রলোভন দর্শন এ সব কিছুতেই তাঁহার চিত্ত বিচলিত করিতে পারিল না। এক রামই যেন সব। এক তাঁহারই চরণচিন্তায় আত্মাকে নিয়োজিত করিয়া তাঁহারই শ্রীচরণ দর্শনের আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎপর রাবণবধের পর তাঁহার বাসনা পূর্ণ

হইল। দশ মাসের পর স্বামিসন্দর্শনে স্বর্গসুখ উপভোগ করিলেন। রাম অতঃপর রাবণভ্রাতা বিভীষণকে লঙ্কাসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া সবান্ধবে সীতাসহ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু কিয়দ্দিবস রাজ্যসুখ ভোগ করার পরেই প্রজাবৎসল লোক-প্রিয় রাম জনগণের মন সন্তুষ্টার্থে সীতাকে পরীক্ষা করিলেন। সীতা অনায়াসে অগ্নিপ্রবেশ করিলেন এবং সাধ্বী সতী সীতা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু আর কিছু দিন পর যখন অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন যে জনসাধারণ সীতার এই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতেও সন্তুষ্ট হয় নাই, তখন তিনি তাহাদের মনোরঞ্জনার্থ প্রাণসম প্রিয়তমা গর্ভবতী সীতাসতীকে পুনরায় বনে পাঠাইলেন। তথায় তিনি মহামুনি বাল্মীকির আশ্রমে অবস্থান করিয়া স্বামীর আদেশ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং নিরন্তরই যে রামচন্দ্র তাঁহাকে নির্দোষ জানিয়াও বনবাসে পাঠাইয়াছেন কায়মনে সদা সর্ব্বক্ষণই কেবল তাঁহারই চরণ চিন্তা করিতে লাগিলেন ও তাঁহারই ধ্যানে মগ্ন রহিলেন। সেই চিন্তায় তিনি সকলই ভুলিয়া থাকিতেন। সেই বনবাসজনিত কষ্ট তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না; অথবা স্বামী যে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, বিনাদোষে বনবাসে পাঠাইয়াছেন, এ চিন্তা কখনও তাঁহার মনে উদয় হইতে পারিত না। তিনি সেই স্বামি-চিন্তায়ই মগ্ন হইয়া থাকিতেন। স্বামি-ধ্যানেই আত্মবিস্মৃতা হইয়া থাকিতেন। তারপর অযোধ্যাপতির অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব যখন সীতা-পুত্রদ্বয় কর্ত্তৃক বাল্মীকির বনে ধৃত হইল এবং তাঁহাদের সহিত

অযোধ্যাপতির বিপুলবাহিনীর সহিত বিষম সংগ্রাম হইতে লাগিল, লব কুশ সতী মায়ের বরে সেই বিপুল বাহিনী বিধ্বস্ত করিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণাদি ভ্রাতৃগণ সমরক্ষেত্রে শায়িত হইলেন এবং অবশেষে স্বয়ং অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র রণক্ষেত্রে নিপাতিত হইয়া মুমূর্ষু প্রায় হইলেন। বিজেতা বালকদ্বয় তখন তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ভ্রাতৃত্রয় সহ শ্রীরামচন্দ্রকে মৃত মনে করিয়া তাঁহাদের বসন ভূষণাদি কাড়িয়া লইয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন এবং সীতার নিকট কয়েক দিনের যুদ্ধবৃত্তান্ত ও তাঁহাদের বিজয়বার্ত্তা আনুপূর্ব্বিক বলিতে লাগিলেন। সতীর প্রাণ দুর দুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এবং সর্ব্বশেষ যখন জ্যেষ্ঠ লব উপহার-স্বরূপ শ্রীরামের কাণের কুণ্ডল মায়ের চরণে উপহার দিতে লাগিলেন, সাধ্বী সীতা অমনি মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন। পুত্রদ্বয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মহর্ষি বাল্মীকির স্মরণ লইলেন। ঋষিবর পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত অবগত ছিলেন, সুতরাং তৎক্ষণাৎ সীতা-সমীপে আগমন করিলেন এবং সতীর চৈতন্যোৎপাদন করিলেন। সীতা স্বামীর জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং পুত্রদ্বয়ের অন্যায় কর্ম্মের জন্য অনুতপ্তা হইলেন ও শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। ঋষিবর তখন সীতার বিলাপে বিচলিত হইয়া অযোধ্যাপতি ও ভ্রাতৃত্রয়কে সঞ্জীবিত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এবং অচিরে তাঁহাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া সীতাসমীপে লইয়া আসিলেন। সীতা আবার বহুকাল পরে স্বামী সন্দর্শন করিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিলেন। অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষির আদেশ লইয়া সতীকে

পুনরায় গ্রহণ করিলেন এবং অযোধ্যায় লইয়া গেলেন। কিন্তু তথায় জনপ্রিয় রাম জনগণ-মনোরঞ্জনার্থ পুনরায় তাঁহার অগ্নিপরীক্ষা করিলেন। সীতা এবারও স্বামীর চরণ স্মরণ করিয়া অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলেন ; কিন্তু আর তাঁহার শ্রীরামের অদর্শনযন্ত্রণা ভোগ করিতে সাহস হইল না, পাছে আবার তাঁহার দর্শনে বঞ্চিতা হন এই ভয়ে এই নরদেহ ত্যাগ করিয়া নিত্যদেহে নিত্য প্রদেশে স্বামী সন্দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতে বিদায় হইলেন। সোণার সংসার—পার্থিব রাজ্য ভোগসুখ সব ত্যাগ করিয়া সতত স্বামী সন্দর্শন সুখ এবং স্বামী পূজার সুখ উপভোগ করিতে স্বর্গধামে চলিলেন।

চিন্তা।

তারপর মহারাজ শ্রীবৎসের চিন্তা। মহারাজ শ্রীবৎস সপ্তম গ্রহের অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়া রাজ্যের মঙ্গলার্থে বন-গমন করিলেন, আর মহারাণী চিন্তা রাজ্য-সুখভোগ সমস্ত ত্যাগ করিয়া অভিশাপ-গ্রস্ত স্বামীর সহগামিনী হইলেন। মহারাণী রাজ্যসুখভোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন, কিন্তু পতিসঙ্গ—পতিসেবা-সুখভোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। মহারাণী হইয়া পদচারণে স্বামীর সঙ্গে বনে চলিলেন এবং কণ্টকাকীর্ণ বনপথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। রাজরাণীর সুকোমল পদ দু'খানি ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল। বনভ্রমণে কত কষ্ট পাইতে লাগিলেন, বনবাস কালে কঠোর পরিশ্রম করিয়া কাঠুরীয়াদের সহিত স্বামিসঙ্গে

পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন? কিন্তু তথায়ও সতার স্বর্গ-সুখভোগ করিতে কেহই বাধা দিতে পারিল না। কোন কষ্টই তাঁহার স্বামীর পদসেবা-সুখে বিঘ্ন জন্মাইতে পারিল না। তিনি সেখানেও সাম্রাজ্যাধিকারিণীর অপেক্ষাও আপনাকে সুখী মনে করিয়া স্বামিসুখে বিভোরা রহিলেন। কিন্তু সপ্তম গ্রহ শনির এ সবই অসহ্য হইল; তিনি বুঝিতে পারিলেন, সতী সঙ্গে থাকিলে তিনি রাজ্যভ্রষ্ট মহারাজকে অভিলাষানুরূপ লাঞ্ছিত করিতে পারিবেন না। অতএব তিনি শ্রীবৎসকে চিন্তা ছাড়া করিতে যত্নবান্ হইলেন। রাজরাণী চিন্তা পানীয় জল আনয়নার্থে স্রোতস্বতী-তীরে যাইয়া দুষ্টচিত্ত সওদাগর কর্ত্তৃক উপকারের অপকার প্রতিদানস্বরূপ অপহৃতা হইলেন। সওদাগর তাঁহাকে আপন তরণীতে তুলিয়া লইল। সতী নানারূপ অনুনয় বিনয়—অনুরোধ উপরোধ করিয়াও তাহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। সওদাগর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিল, আর তিনি অনবরত বিলাপই করিতে লাগিলেন। দুষ্টচিত্ত সওদাগর তাঁহার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া দুষ্ক্রিয়ায় মনকে নিয়োজিত করিল, সতীর সতীত্ব ধন কাড়িয়া লইতে যত্নবান্ হইল। কতরূপ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, কতরূপ প্রলোভন দেখাইতে আর কত প্রকারে তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল, কিন্তু সতী কিছুতেই স্বীয় স্বামি-চিন্তা—শ্রীবৎস-চিন্তা অন্তর হইতে অন্তর্হিত করিলেন না। তাঁহার মানসপটে মহারাজ শ্রীবৎসের চিত্রখানি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। কিন্তু এদিকে দুষ্ট সওদাগর কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, অবশেষে বলপ্রয়োগ

করিতে মনন করিল। কিন্তু পতিপ্রাণা সতী পাপিষ্ঠের পাপ সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া, কথিত আছে—পূর্ব্বেই সূর্য্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া আপনার ওরূপ জগৎ-ভুলান সৌন্দর্য্যময় রূপ পরিত্যাগ করত কদাকার গলিতকুষ্ঠময় রূপ ধারণ করিলেন এবং আপনাকে সওদাগরের পাপদৃষ্টির বাহিরে সরাইয়া লইলেন। তাঁহার এই রূপ দেখিয়া সওদাগরের চিত্ত হইতে পাপ বাসনা দূরে সরিয়া গেল, সে রূপমোহ আর থাকিতে পারিল না। সে বিরক্ত হইল, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল না, নিজের উপকারের জন্য তাঁহাকে কয়েদ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিল।

ওদিকে মহারাজ শ্রীবৎস শনি কর্ত্তৃক নানারূপ লাঞ্ছিত হইয়া অবশেষে আর এক সওদাগর কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন এবং সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপিত হইলেন; কিন্তু অবশেষে কোন ক্রমে প্রাণ বাঁচাইয়া তথা হইতে মহারাজ ভদ্রকের রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় আবার রাজকুমারী ভদ্রা মহারাজ শ্রীবৎসকে স্বামীরূপে পাইবার নিমিত্ত, কথিত আছে—শূলপাণি মহাদেবের আরাধনা করিতেছিলেন এবং দেবাদিদেবও তাঁহার পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া, "তোমার বাসনা পূর্ণ হো'ক" এইরূপ বর দিয়াছিলেন। রাজকুমারী ভদ্রা তখন প্রহৃষ্টমনে মাতৃসমীপে আপন স্বয়ংবরের অভিলাষ ব্যক্ত করায়, রাণী মহারাজ ভদ্রককে কন্যার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন এবং মহারাজ অচিরে তাহার স্বয়ংবরসভা আহূত করিলেন। ভদ্রার স্বয়ংবরবার্ত্তা রাজ্যমধ্যে বিঘোষিত হইল। তখন অতি অল্প দিনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট দিনে স্বয়ংবর-সভা আহূত হইল। নানা দেশ-বিদেশ হইতে রাজন্যবর্গ আসিয়া

সভাস্থল সুশোভিত করিলেন। এদিকে রাজ্য ভ্রষ্ট মহারাজ শ্রীবৎস শনির প্রকোপে ঘুরিতে ফিরিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দরিদ্রাবস্থা—দীনবেশ দেখিয়া কেহই তাঁহাকে চিনিতেপারিল না। তিনি অতি সামান্য এক জন দরিদ্র দর্শকের ন্যায় স্বয়ংবরসভার সন্নিকট একটী গাছের নীচে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাজকুমারী ভদ্রা সুন্দর সাজ-শয্যায় সজ্জিতা, সুশোভিতা ও সু-অলঙ্কৃতা হইয়া দাসীসমভিব্যাহারে পতি বরণ করণার্থ মালাচন্দন হস্তে স্বয়ংবরসভায় আগমন করিলেন। রাজন্য-বর্গ, কে এই অপরূপ রূপবতী স্বর্গীয়সুষমা-সজ্জিতা রাজকুমারীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবেন, কাহার ভাগ্যে চন্দনবিন্দু সুশোভিত হইবে, কে এমন ভাগ্যবান্ যাঁহার কণ্ঠদেশে ঐ সুকোমলহস্তস্থিত মালাটী স্থিত হইবে, কাহার কণ্ঠে এই স্ত্রীরত্নটী কণ্ঠহাররূপে শোভা পাইবে, ইহা আপন আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে পরিচারিকা একে একে সকল রাজন্যবর্গের বংশাবলীর পরিচয় দিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব গুণগাথা বর্ণনা করিতে লাগিল। ভদ্রা একে একে সমস্তকে অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন, রাজন্যবর্গ আপন আপন ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন, এবং তবু ও উৎকণ্ঠিত প্রাণে ভদ্রার পানে তাকাইয়া রহিলেন। এ দিকে ভদ্রা একে একে সমস্তকে অতিক্রম করিলেন, কিন্তু কোথায়ও তাঁহার প্রাণপতির মনঃ কল্পিত মূর্ত্তিখানি না দেখিতে পাইয়া বিচলিতা হইলেন এবং দেবাদি-দেব মহাদেবকে স্মরণ করিলেন,—দেবতা সুপ্রসন্ন হইলেন। রাজ-কুমারী ভদ্রা অদূরে বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন,

তথায়ই তাঁহার হৃদয়বল্লভ প্রাণপতি যাঁহার মূর্ত্তি তিনি কেবল কল্পনায়হৃদয়ে চিত্রিত করিয়াছিলেন, দীনবেশে সেই মূর্ত্তিখানি বৃক্ষের নীচে দণ্ডায়মান। দেখিয়া চিনিলেন এবং হৃষ্টান্তঃকরণে তৎসন্নিকটে যাইয়া প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে বরমালা অর্পণ করিলেন। সভাস্থ রাজন্যবর্গ তখন নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই, মহারাজ ভদ্রক কর্ত্তৃক অভিশপ্ত রাজ্যভ্রষ্ট রাজাধিরাজ মহারাজ শ্রীবৎসের পরিচয় পাইয়া সকলে সন্তুষ্টচিত্তে স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন। তারপর মহারাজ ভদ্রক রাজাধিরাজ শ্রীবৎসকে যথারীতি সংস্কৃত করিলেন এবং আপন সিংহাসনে তাঁহাকে স্থাপিত করিয়া আপনাকে ধন্য বোধ করিলেন। কিন্তু মহারাজ শ্রীবৎস সপ্তম গ্রহের দশা অবসানপ্রায় জানিয়া মহারাণী চিন্তাকে পাইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলেন এবং সিংহাসনের পরিবর্ত্তে স্রোতস্বতীর তীরে সামান্য একখানা ভবনের বাসনা প্রকাশ করিলেন। মহারাজ ভদ্রক অনতিবিলম্বে তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ করিলেন। মহারাজ শ্রীবৎস তখন চিন্তার চিন্তায় আপন চিত্তকে নিয়োজিত করিলেন এবং ভদ্রা সর্ব্বদা তৎসমীপে অবস্থান করিয়া পতিসেবা-সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন এবং স্বপত্নীর শোকে চিন্তাযুক্ত অনুতপ্ত মহারাজকে নানা প্রকারে শান্তিদান করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। মহারাজকে এ অবস্থায় অধিক দিন অতিবাহিত করিতে হইল না, অল্প কালমধ্যেই রাজাদেশে সেই দুষ্ট সওদাগর ধৃত হইল। মহারাজ শ্রীবৎস চিন্তাদেবীকে ফিরিয়া পাইলেন, আর দেবীও স্নানান্তে আপন রূপ ফিরিয়া পাইয়া স্বামি-

সন্দর্শনে সুখী হইলেন। ভদ্রা তাঁহাকে আপন জ্যেষ্ঠা সহোদরার ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যে সপ্তমগ্রহের প্রকোপ প্রশমিত হইল, মহারাজ শ্রীবৎস চিন্তা ও ভদ্রা সহ স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রজাগণ তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে প্রাণ পাইল। আর মহারাণী চিন্তা ভদ্রার সুখের জন্য আপন স্থানে ভদ্রাকে অধিকার দিলেন এবং স্বামীর সুখে সুখী হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে স্বামিসেবা করিতে লাগিলেন।

দময়ন্তী।

রাজকুমারী দময়ন্তী মহারাজ নলের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ব হইতে প্রাণে প্রাণে তাঁহাকে ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকেই আপন প্রাণে পতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহারই মূর্ত্তিকে অন্তরে অন্তরে পূজা করিতেছিলেন। আপনাকে তিনি একেবারে নলগতপ্রাণা করিয়া ফেলিয়া ছিলেন, তা'ই স্বয়ংবর-সভায় দেবতাগণের দেবত্ব তুচ্ছ করিয়া সেই দেবসভায় মহারাজ নলকে পতিত্বে বরণ করিয়া পরিতৃপ্তা হইলেন; আর দেবতারাও দময়ন্তীর এবম্বিধ ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া এবং মহারাজ নলের সদ্ব্যবহার এবং সদাচারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানারূপ আশীর্ব্বাদ এবং বর প্রদান করিলেন। কিন্তু কলিরাজের মন নলের দময়ন্তী-প্রাপ্তির জন্য ঈর্ষান্বিত হইল। মহারাজ নল কলির কোপে পড়িলেন। কলিরাজ অক্ষক্রীড়া-কৌশলে মহারাজের রাজত্ব এবং ধনরত্নসমূহ কাড়িয়া লইলেন। শুধু তা'ই নয়, অবশেষে সেই সতী দময়ন্তীকে হরণ করিবারও ফাঁদ

পাতিলেন। কিন্তু সতীর স্বামিভক্তিরূপ রক্ষাকবচের জোরে তাহা হইয়া উঠিতে পারিল না। কলিরাজের উত্তেজনায় নল-ভ্রাতার শত চেষ্টায়ও সে কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারিল না। সাধ্বী দময়ন্তী হৃতসর্ব্বস্ব মহারাজ নলের সহিত বনগমন করিলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ে বনভ্রমণ এবং বনবাস করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহাদের কত কষ্ট হইল—কত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। কলিরাজ কত প্রকারে তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত করিলেন—দুজনকে একখানি বস্ত্রের দু'টী অঞ্চল পরাইলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার ঈর্ষ্যানলের উপশম হইল না। তিনি পতি হইতে সতীকে বিচ্ছিন্ন করিলেন। কিন্তু সতী সাধ্বী দময়ন্তীর পতিভক্তি-পুণ্যফলের নিকট অবশেষে তাঁহাকে পরাস্ত হইতে হইল। কত বৎসর লাঞ্ছনা ভোগের পর স্বয়ংবরচ্ছলে আপন পতিকে চিনিয়া লইলেন। কলিরাজ হা'র মানিয়া নিরস্ত হইলেন। মহারাজ নল আপন সিংহাসন ফিরিয়া পাইলেন, ভ্রষ্টরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন।

তা'র পর সাবিত্রী। সেই পতিপ্রাণা সতীর বাক্যে অতিকঠিন-হৃদয় যমও আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেলেন। সাবিত্রী যমের করাল কবল লইতে কৌশলে সত্যবানকে কাড়িয়া লইলেন। কি চরিত্র, কি তেজ, কি দৃঢ়তা, কি কমনীয়তাই বটে! তোমরা আদর্শের জন্যে আজ দেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইতেছ, কিন্তু ইঁহাদের প্রত্যেকের চরিত্রে কত কি রহিয়াছে একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? এই সমুদয় প্রাতঃস্মরণীয়া নারীদের চরিত্র একবার পাঠ করিয়াছ কি? সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, চিন্তা ইঁহাদের প্রত্যেকেই কিরূপ পতি-

প্রাণা ছিলেন একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ইঁহারা প্রত্যেকেই সতত পতিসঙ্গ লাভ করিবার জন্য রাজ্যভোগ-সুখ অতি তুচ্ছ ভাবে ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের পতিভক্তি কত প্রবল একবার ভাবিবার অবসর পাইয়াছ কি? তাঁহাদের ত্যাগের ক্ষমতা কত বেশী তাহা তলাইয়া দেখিয়াছ কি? রাজ্যভোগ-সুখ তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন,—অনায়াসে অবিচলিতচিত্তে ভিখারিণীর বেশ ধারণ করিলেন। ভোগবাসনার জন্য বারেক ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। কত বড় হৃদয়! তা'র পর তা'দের সহিষ্ণুতা! রাজকুমারী রাজবধূ রাজরাণী—তাঁদের তুলনায় তোমরা কি? তাঁহারা অতি হৃষ্টচিত্তে অতিশয় সুখের সহিত পাদচারিণী হইয়া বনবাসিনী হইলেন। যাঁহারা আশৈশব রাজভবনে রাজার গৃহে প্রতিপালিতা, যাঁহারা শত শত দাস দাসী কর্তৃক পরিসেবিতা, যাঁহাদের পা দু'খানি কখনও ভূমিতে পড়িতে পারে নাই, তাঁহারা অতি সুখের সহিত কণ্টকাকীর্ণ পথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই সোণার কমলসদৃশ পা দুখানি তাঁহাদের ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। পতিপ্রাণা সতীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই! যাহারা আশৈশব দুগ্ধ ফেণনিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আসিয়াছে, আ'জ তাহারা বনভূমে পর্ণকুটীরে তৃণশয্যায় শায়িতা হইয়া সুখবোধ করিতেছে! কত ত্যাগ, কত সহিষ্ণুতা, কিরূপ পতিপ্রেম! যাঁহারা রাজভবনে রাজভোগে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন না, স্বামিসঙ্গে আ'জ বনবাসে সামান্য মাত্র ফলমূল গ্রহণে তাঁহারা কিরূপ সন্তুষ্টা। যাঁহাদিগকে কোন দিন কোন সামান্য পরিশ্রম করিতে হয় নাই, যাঁহারা

আশৈশব সতত অতি আয়াসে দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন, আ'জ বনবাসে তাঁহারা দরিদ্রবেশে নিতান্ত দীন দুঃখীর ন্যায় যে কোন কাজ করিতে কুণ্ঠিতা নন্ বা ক্লান্তি বোধ করেন না। কি সহিষ্ণুতা! ইহার প্রত্যেকটী চরিত্র কত উচ্চ আদর্শ, প্রত্যেকেরই চরিত্রে একাধারে কত কি রহিয়াছে।

তা'র পর তাঁহাদের শিক্ষা,—তাঁহারা কি সামান্য শিক্ষায় শিক্ষিতা ছিলেন? শিক্ষার দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, ইঁহাদের শিক্ষা কি অসামান্য উচ্চ বল দেখি। তোমরা কি শিক্ষা করিতে চাও? খুঁজিয়া দেখ ইঁহাদেরই ভিতর সকলই রহিয়াছে। কিন্তু তোমরা সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলে হয়, তোমাকে সেইরূপ অভ্যস্তা করিতে পারিলে হয়! যদি পারিতে, তবে দেখিতে পাইতে তাঁহারা কত উন্নতা, কত শিক্ষিতা এবং কত স্বাধীনা!

তৎপর সাধারণ শিক্ষার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও এদেশী স্ত্রীলোকেরা অন্য দেশী স্ত্রীলোক হইতে উচ্চতর আসনে উপবেশন করিবার উপযুক্তা। পৃথিবী এ পর্য্যন্ত ক'জন লীলাবতী প্রসব করিতে পারিয়াছিল? কয়টী খনা এ পর্য্যন্ত পৃথিবী বক্ষে ধারণ করিতে পারিয়াছে? কয়টী গার্গী পৃথিবীর অন্য স্থানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে? কয়টী পদ্মিনী পাওয়া যাইতে পারে? কে তোমরা এ পর্য্যন্ত বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ইঁহাদের একটীর মত হইতে পারিয়াছ? তবে কি করিয়াছ? কি লাভ করিতে পারিয়াছ? কতদূর উন্নত হইয়াছ? একটু ও নয়! হারাইয়াছ পাও নাই, হারিয়াছ জিতিতে পার নাই; কোন দিন পাইবেও

না। এ দেশে ও সব বিদেশী ভাব খাটিবে না, এ জল-বায়ুতে ও সব সইবে না, এ দেশের সঙ্গে কখনও অন্য দেশের তুলনা হইতে পারিবে না। তাই বলিতেছিলাম, এ দেশের তুলনা কেবল এ দেশেরই সঙ্গে হইতে পারে।

সুতরাং বৃথা কথা বলিয়া লাভ নাই। মিছামিছি স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিও না; কেন না, তাহাতে কোন লাভ নাই। লেখাপড়া শিখ, সদা-সৎ বুঝিতে সক্ষম হও, কাজ করিতে শিখ, আপন কর্ত্তব্য পালনে প্রস্তুত হও। মিছামিছি ঝগড়া করিও না, এ শ্মশানকে আরও শ্মশান করিও না। যে যাহার কর্ত্তব্য পালন কর, তাহাতে সুখ পাইবে, হৃদয়ে শান্তি ফিরিয়া পাইবে; এবং দেখিতে পাইবে তোমরাও স্বাধীন, তোমাদেরও স্বাধীনতা আছে, তোমরাও পরাধীন নও। লেখা পড়া শিখ, সদ্‌জ্ঞান লাভ কর, সুখদায়ক সদ্‌গ্রন্থ পাঠ কর, জগতে সৎসঙ্গের আলোচনা কর, কিসে দেশের উন্নতি হয় তাহা ভাব বুঝ দেখ লিখ, কেহই তোমাদিগকে নিষেধ করিবে না। আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া নানারূপ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, কেহই তোমাদিগকে নিবৃত্ত করিবে না। দেখিতে পাইবে কোথায়ও তোমরা পরাধীন নও, সর্ব্বত্রই তোমরা স্বাধীন। দেখিতে পাইবে আমরাও যেমন, তোমরাও তেমন। দেখিতে পাইবে আমাদের অধিকার এবং তোমাদের অধিকার একই সমান। আমরাও যেমন স্বাধীন, তোমরাও তদ্রূপ; আর তোমরাও যেমন অধীন, আমরাও সেইরূপ। তোমাদের অধিকার আমাদের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। আমরা যদি ঘরের দো'র বন্ধ করিতে

পারি, তোমরা তা'হ'লে ভাতের হাঁড়ি বাজেয়াপ্ত করিতে পার। আমরা যেমন তোমাদিকে অন্দরে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারি, তোমরাও তেমন আমাদিগকে কেবল বাহিরে বেড়াইতে বাধ্য করিতে পার। আমরাও যেমন তোমাদিগকে আমাদের অধীন করিয়া রাখি, তোমরাও তেমনি আমাদিগকে অধীন করিয়া রাখ। আর যদি লেখা পড়া না শিখ, ভাল মন্দ বুঝিতে চেষ্টা না কর, সৎশিক্ষালাভ করিতে প্রয়াসী না হও, সদসৎ বিবেচনা করিতে না শিখ, কেবল দু' চা'র খানি মাত্র নাটক নভেল পড়িয়া 'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী' হইয়া বিদেশী সভ্যতালোকে ঝলসিত হইয়া সতৃষ্ণ-নয়নে বিদেশী আদর্শের দিকে ক্ষণ দৃষ্টি কর, যদি চরিত্র গঠন করিতে না পার, যদি কাজ করিতে না শিখ, যদি আপন কর্ত্তব্য পালনে প্রস্তুত না হও, যদি কেহ মন প্রাণ খাটাইয়া কাজ করিতে প্রস্তুত না হও, যদি সংসারে সংসারী সাজিতে অপ্রস্তুত হও, যদি আপন কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া কেবল সভা-সমিতিতে মাতব্বরী করিতে প্রয়াসী হও, তবে সংসারও ভাল লাগিবে না, কিছু পড়িতে শিখিতে জানিতে কিংবা বুঝিতেও পারিবে না ; সংসারের সুখভোগ করাও তোমাদের ভাগ্যে হইয়া উঠিবে না। তাহা হইলে সততই দেখিবে তোমরা পরাধীন—পরমুখাপেক্ষী। দেখিবে তোমরা পিঞ্জরা-বদ্ধ পাখী।

স্বাধীনতা কি জান? স্বেচ্ছাচারিতাকে স্বাধীনতা বলে না। স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করাও যায় না। পরাধীনতায়ই স্বাধীনতা মিলিয়া থাকে। স্বাধীন হইতে হইলে পরস্পর পরাধীন

ওয়া একান্ত দরকার। এই পরাধীনতা ব্যতীত কখন স্বাধীনতা াভ হয় না, ইহার সর্ব্ব অবস্থায়ই এইরূপ। কর্ম্মের অধীন হও, র্ত্তব্যের অধীন হও, আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন কর, সুখী হইবে—া‌ন্তি পাইবে। সুতরাং কাজ কর, আপন কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিলে দিব্যজ্ঞানও লাভ করা যায়। কথিত আছে,—একটী যুবক যৌবনের প্রারম্ভেই তাহার সংসারধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধা ন্মায়, সংসার ত্যাগ করিয়া কোন একটী পর্ব্বতে যাইয়া পর্ব্বত-গুহায় একজন সন্ন্যাসীর নিকট যোগ শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং ার বৎসর কাল যোগ অভ্যাসাদি করিয়া সিদ্ধিলাভ করত আবার তাঁহার যখন সংসারীদের অবস্থাটা অবলোকন করিতে সাধ হয় তখন তিনি পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া সুদূর প্রান্তরে গমন করেন। কিন্তু পথিমধ্যে পথশ্রম হেতু ক্লান্তিনিবন্ধন প্রান্তরে একটী গাছের নীচে উপবেশন করেন। দৈবাৎ তখন একটী কাক আসিয়া সেই গাছের একটী শুষ্ক ডালের উপর বসে। কিন্তু ডালখানি তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া গাছের তলে উপবিষ্ট সেই নবীন যোগীর অঙ্গে পতিত হয়। যোগিবর তখন ঊর্দ্ধদৃষ্টি করত কাকের পানে তাকান, কাকটী তাঁহার দৃষ্টিমাত্র ভস্মীভূত হইয়া যায়। যোগীবর তাঁহার এ প্রকার ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়।

যা'ই হো'ক, তিনি ক্ষণকাল বিশ্রামের পর অনতিদূরে অবস্থিত পল্লীর দিকে চলিলেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যে পল্লীর বহির্ভাগে অবস্থিত একখানি পর্ণ-কুটীরের সমীপে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষার্থে "বাড়ীতে কে আছ" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। অনেক

বার ডাকিলেন, কিন্তু কোনরূপ সাড়া শব্দ পাইলেন না, বাড়ীতে কেহ ছিল না এরূপ অনুমানও তিনি করিতে পারিলেন না ; সুতরাং পুনঃ পুনঃ ডাকিতেই লাগিলেন। কিন্তু ব্যর্থচেষ্ট হইয়া রোষকষায়িত লোচনে সেই পর্ণ-কুটীরের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। কিন্তু এবার আর আগুন জ্বলিল না—পর্ণ-কুটীর তখন ভস্মীভূত হইল না। যোগিবর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইতি মধ্যে তখন কে একজন সেই পর্ণ-কুটীর হইতে ডাকিয়া বলিল, "ঠাকুর, এ কাক নয়, মানুষ। ঐখানে একটু অপেক্ষা কর, আমার হাতের কাজ শেষ করিয়া লই, তা'র পর তোমাকে ভিক্ষা দিব।" সন্ন্যাসী এই কথা শুনিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা তখন ভুলিয়া যাইয়া, প্রান্তরে যাহা করিয়াছেন গৃহস্থবালা এখান হইতে কিরূপে তাহা জানিতে পারিল তাহা অবগত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিতমনে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পর গৃহস্থবধূ ভিক্ষা লইয়া তৎসমীপে আসিলেন এবং সন্ন্যাসী তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা,—আমি প্রান্তরে যাহা করিয়াছি এখান হইতে কিরূপে তাহা তুমি অবগত হইতে পারিলে ? তুমি কি এখান হইতেই দেখিতে পাইয়াছিলে ? অথবা আর কেহ দেখিয়া তোমাকে বলিয়া দিয়াছে কিংবা আর কি উপায়ে তুমি সেই প্রান্তরে সংঘটিত ব্যাপারের বিষয় অবগত হইলে ?" গৃহস্থবধূ তখন অবনত বদনে উত্তর করিলেন, "ঠাকুর, এখান হইতে প্রান্তরস্থিত বৃক্ষ অনেক দূরে অবস্থিত, আমি তথায় যাইও নাই, দেখিতেও পারি নাই ; আর কেহ আমাকে বলিয়াও

দেয় নাই। আর আমার হাতে কাজ থাকায় বাস্ততানিবন্ধন আমি যেরূপে ইহা জানিতে পারিয়াছি তাহা তোমাকে এখন বলিতেও পারিতেছি না। কিন্তু তুমি যদি অল্প দূরে অবস্থিত ঐ বাজারে যে কষাইয়ের দোকান দেখিতে পাইবে, সেই দোকানে যাইয়া কষাইকে যদি এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, সেই তোমাকে ইহার প্রকৃত উত্তর বলিয়া দিবে। তোমার যদি জানিবার জন্য একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তুমি তাহার নিকট গমন কর, সে তোমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া সন্তুষ্ট করিবে।” বলিয়া গৃহস্থবধূ বিদায় গ্রহণ করিল। সন্ন্যাসী ঠাকুর তখন ধীরে ধীরে কষাইয়ের দোকানের উদ্দেশে গমন করিলেন।

অনতিদূরে অবস্থিত ক্ষুদ্র পল্লীবাজার। সন্ন্যাসী ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কষাই মহা ব্যস্ত। ঠাকুর তাহাকে ডাকিলেন, সে কোন উত্তর করিল না, আপন মনে আপন কাজ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বেলা তখন বড় বেশী ছিল না; সূর্য্যদেব ক্রমেই অস্তাচলের অধিক নিকটবর্ত্তী হইতেছিলেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর ঘন ঘন তাঁহারদিকে এবং কষাইয়ের দিকে তাকাইতে ছিলেন। কিন্তু কষাই এবংবিধ ভাবের দিকে বারেক ভ্রূক্ষেপও করিল না, সে যথাসাধ্য নিজের কাজ করিতে লাগিল। কিছু সময় পর সূর্য্যদেব অস্তাচলে নিমগ্ন হইলেন, সন্ধ্যা হইল; সন্ন্যাসীর বদনমণ্ডলে চিন্তার ছায়া দেখা দিল। এদিকেও আস্তে আস্তে সন্ধ্যার সুন্দর দৃশ্য একটু একটু করিয়া আঁধারে মিশিয়া যাইতে লাগিল। কষাইয়ের দোকানের ভিঁড়

ক্রমে ক্রমে কামতে লাগল। ক্ষণকাল পর কষাই আর কোন গ্রাহক না দেখিয়া আস্তে আস্তে দোকান পাট এবং অস্ত্রাদি পরিষ্কার করিয়া দোকানের দরজা বন্ধ করত ধীরে ধীরে সান্ধ্যসমীরণ গায়ে মাখাইতে মাখাইতে গৃহাভিমুখে চলিল। সন্ন্যাসী তখন আস্তে আস্তে তাহার অনুসরণ করিল। কিন্তু কষাইয়ের মুখে তখনও কোন কথাটী নাই। সে অচিরে বাড়ী পৌঁছিয়া আপন বৃদ্ধ পিতার পদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া, যথারীতি তাহাকে ভোজনাদি করাইল এবং তৎপর তাহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া অবশেষে বাহিরে আসিল এবং তথায় দণ্ডায়মান সন্ন্যাসীকে তাহার নিকটে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সন্ন্যাসী তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাবলী তাহার নিকট বিবৃত করিলেন। কষাই তদুত্তরে তাঁহাকে বলিল,—"ঠাকুর, এ সংসারে সকল ধর্ম্মই সমান, কোনটী ছোট কিংবা বড় নয়; সকল ধর্ম্মেই মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। যে পথেই চল, সে পথই সেই ঠিক্ তথায়ই যাইবে। সকল নদীই সমুদ্রাভিমুখী, সকলের জলই সমুদ্রে গিয়া পড়িবে। যে কোন ধর্ম্ম হউক না, সকলেরই নিদান একই সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বময় পরমেশ্বর। সুতরাং যে যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হো'ক না কেন, যদি সে, সেই ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্যগুলি যথারীতি যথাসাধ্য প্রাণপণে প্রতিপালন করিতে পারে, তবে তাহাতেই সে দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম এবং পরিণামে পরমপদ লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। এইরূপই আমাদের সামান্য শিক্ষায় আমরা অবগত আছি। এই আমাদেরই কথা ভাবিয়া দেখ না কেন?

তুমি যৌবনের প্রারম্ভে সংসারধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়া বনে চলিয়া গেলে এবং তথায় উপযুক্ত গুরু দ্বারা সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যথারীতি যোগ সাধন করিতে লাগিলে। তুমি তখন সন্ন্যাসী, সেই সন্ন্যাসধর্ম্মানুমোদিত যোগ প্রাণায়ামাদি যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহা যথাসাধ্য প্রতিপালন করিতে লাগিলে এবং তাহার ফলে তুমি দিব্য জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে এবং ঐ যে গাছের ডালে কাকটীকে ভস্মীভূত করিয়াছিলে তাহাও তাহারই যোরে। তোমার দৃষ্টিতে যে দাহিকা শক্তি তাহাও তুমি তোমার সেই সন্ন্যাস-ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্যগুলি যথারীতি সম্পন্ন করাতে তাহা হইতেই পাইয়াছ। তুমি সন্ন্যাসী, তোমার সন্ন্যাসধর্ম্মে যাহা কর্ত্তব্য তাহা তুমি যথারীতি এবং যথাসাধ্য পালন করাতেই তুমি দিব্য জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছ এবং তোমার দৃষ্টিশক্তিতে দাহিকা শক্তি আবির্ভূত হইয়াছে। এ তোমার কর্ত্তব্য পালনের ফল। আর যে সেই গৃহস্থ-বালা বধূকে দেখিয়াছ, সে সংসারধর্ম্মাবলম্বী—সংসারী এবং এই ধর্ম্মানুসারে পতি তাহার পক্ষে একমাত্র পূজ্য বা আরাধ্য দেবতা এবং সেই পতি দেবতার পূজা যথাসাধ্য সম্পন্ন করাই হিন্দুধর্ম্মের সংসারী সধবা স্ত্রীলোকের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া অনুমোদিত এবং সেই কর্ত্তব্য সে যথাসাধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। তুমি যখন সেই গৃহস্থদ্বারে উপস্থিত হইয়া পুনঃ পুনঃ ডাকিতেছিলে তখন সেই গৃহস্থবধূ তাহার রুগ্ন পতির পরিচর্য্যা করিতেছিল, কাজে কাজেই তখন সে সেই মুহূর্ত্তে তোমার নিকটে আসিয়া তোমাকে ভিক্ষা দিতে পারে নাই; রুগ্ন স্বামীর পরিচর্য্যার পরিসমাপ্তি

করিয়া তবে সে তোমার নিকট আগমন করিয়াছিল। তাহার এই কর্ত্তব্যপরায়ণতায় পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ তাহাকে দিব্য জ্ঞান দান করিয়াছেন আর তোমার দৃষ্টিশক্তিতে যে দাহিকা শক্তি আছে এবং যাহার সাহায্যে তুমি তখন তাহার পর্ণকুটীর ভস্মীভূত করিতে চাহিয়াছিলে তাহার প্রতিকূলে দাঁড়াইবার শক্তি সে তাহা হইতেই লাভ করিয়াছে। এ তাহার সে যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে তদনুমোদিত কর্ত্তব্য পরায়ণতার প্রতিদান। আর এই যে আমাকে দেখিতেছ, আমিও সংসারধর্ম্মাবলম্বী সংসারী। সংসারীর পক্ষে পিতা পরম গুরু; তাঁহার চরণ সেবা করাই পরমগতির কারণ। আমি পিতৃসেবাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য বুঝিয়া তাহাই আমার যতটুকু সাধ্য সম্পন্ন করিতেছি। জীবিকার জন্য আমি এই ব্যবসা করিতেছি, ইহাতে যাহা কিছু সামান্য লাভ হয়, তদ্দ্বারা আমি আমার যতটুকু সাধ্য আমার বৃদ্ধ পিতার সেবা করিতেছি। তুমি যখন আমার নিকট আসিলে, সেই কর্ত্তব্য পালনে বিঘ্ন হইতেছে বলিয়া আমি তন্মুহূর্ত্তে এবং এমন কি তৎপরেও তোমার সহিত কোন কথা বলিতে পারি নাই, বলিলে পাছে বৃদ্ধ পিতা আমার কোনরূপ কষ্ট পা'ন। কাজে কাজেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে পর্য্যন্ত না আমার পিতৃসেবা পরিসমাপ্ত হইল, সে পর্য্যন্ত আমি তোমার সহিত কোনরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে পারিলাম না। এখন পিতা আমার আহারান্তে শয়ন করিয়াছেন, আমি অবসর হইয়াছি, এখন আমি কর্ত্তব্য আবদ্ধ নই, এ সময় আমার, তা'ই এখন তোমার নিকট আসিয়াছি। আমার এই অতি সামান্য

সেবায় বোধ হয় পিতা আমার সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ভগবানের নিকট আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছেন; আর ভগবান্‌ও বোধ হয় আমার এই অতি সামান্য কর্ত্তব্যপরায়ণতায় প্রসন্ন হইয়াছেন এবং এই অধম আমাকেও তিনি দয়া করিয়া দিব্যজ্ঞান দান করিয়াছেন। তাহার সাহায্যে তুমি যে মাঠে কাক পোড়াইয়াছ এবং তৎপর গৃহস্থবধূর নিকট পরাজিত হইয়াছ, এ সমুদয় তুমি এখানে আসিবার পূর্ব্বেই আমি সেই দিব্যজ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারিয়াছি। তা'ই বলিতেছি, যে যে ধর্ম্ম গ্রহণ করুক্ না কেন, যদি সে সেই ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্যগুলি যথারীতি এবং যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতে পারে, আমার বিশ্বাস তাহার প্রতি ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন ও তাহাকে দিব্যজ্ঞান দান করিবেন এবং অন্তেও তিনি সুপ্রসন্ন হইয়া তাহার পরম গতির বিধান করিবেন। তাই বলি—ঠাকুর, কোন ধর্ম্মই ছোট নয়, কেহই ছোট নন। যে যে ধর্ম্ম অবলম্বী, তাহার নিকট সেই ধর্ম্মই বড় এবং সেই ধর্ম্মানু-মোদিত কর্ত্তব্যপালনেই তাহারই মুক্তি হইতে পারে, ইহাই আমার বিশ্বাস।" সন্ন্যাসী কষাইয়ের নিকট এই প্রকার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তথা হইতে বিদায় হইলেন। কষাই তখন দৈনিক পরিশ্রমের পর শ্রান্তিদূর ও আহারাদি করণার্থ গমন করিল।

ইহা হইতে আমরা কি দেখিতে পাই? ইহা দ্বারা কি বুঝিতে পাই? আপন কর্ত্তব্য যথাসাধ্য প্রতিপালন করিতে পারিলে অসামান্য দিব্যজ্ঞান, এমন কি, মুক্তিপদ পর্য্যন্ত লাভ করা যাইতে পারে। সামান্য স্বাধীনতা ইহার কাছে অতি অল্প কথা। তা'ই

বলি স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালনে যত্নবান্ হও,—যে যাহার আপন কর্ত্তব্য যথাবিধি সম্পন্ন করিতে যত্নবান্ হও। যা' ইচ্ছা তা'ই বলিও না, যা' ইচ্ছা তা'ই করিও না। মিছামিছি অন্যায় দাবী করিয়া যন্ত্রণা বাড়াইও না। তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর এবং প্রাপ্য যাহা বুঝিয়া লও। স্বাধীন হইবে সে ত ভাল কথা, স্বাবলম্বী হইবে সেত সুন্দর যুক্তি! কিন্তু প্রথমে লেখা পড়া শিখ, সৎশিক্ষা লাভ কর এবং সৎসঙ্গে থাকিয়া চরিত্রখানি সুন্দর করিয়া গঠন কর। স্বাধীন হইবে সে ত সুখের কথা; কিন্তু স্বাধীনতা কি? তাহা একবার ভাল করিয়া আগে বুঝিয়া দেখ। স্বাবলম্বী যদি হইতে পারিতে তাহা হইলে ত পুরুষদের দুঃখের অনেকটা লাঘব হইতে পারিত। সুতরাং সে ত অতিশয় সুখের বার্ত্তা, কিন্তু কিছু বলিবার আগে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ তোমরা স্বাবলম্বী হইতে পার কি না? মোট কথা, যাহাই বল আর যাহাই কর, বলিবার কিংবা করিবার পূর্ব্বে সেই বিষয়টী বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া লও ইহাই বক্তব্য।

কিন্তু এই সব ভাবিতে, বুঝিতে এবং বলিতে হইলে উচ্চ শিক্ষা পাওয়া দরকার এবং সেই উচ্চ শিক্ষা এদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া চাই। কিন্তু বুঝিতে পারি না কোন্ জ্ঞানী ভদ্রলোক কিরূপ জ্ঞানের প্রভাবে স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষায় অপক্ষপাতী হইলেন! যদি কেহ হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি একলা হইবেন, আমরা কেহ তাঁহার সঙ্গে নই। আমরা বলিব যথা সম্ভব উচ্চ শিক্ষা দাও, তাহা না হইলে আমাদের যে অনেক অসুবিধা! তাহারা শিক্ষিতা না হইলে আমাদের যে এক পাখায়ই উড়িতে হয়! এক কথায়

আমি যাহা বুঝি, আমি যাহা ভাবি, এবং আমি যাহা করি, তাহা যদি আমার গৃহিণী ভাবিতে বা বুঝিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে যে বড়ই মুস্কিল। তাহারা যদি শিক্ষিতা না হয়, তাহাদের যদি চিন্তা করিবার ক্ষমতা না হয়, তাহা হইলে যে প্রতিপদে আমাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে যে আমরা প্রতিপদে আটকাইয়া যাই! বর্ত্তমানে আমাদের অসুবিধাই ত তা'ই! আমরা এ দেশে যে আধখানা মাত্র, অপর আধখানা যে অবশ, অলস এবং অচল প্রায়! সেই আধখানি যে একবারেই চলিতে পারে না, সে যে কেবল ভাঙ্গা ঢেঁকি, সব সময়ই বিড়ম্বনাজনকের মত হইয়া আছে! বর্ত্তমানে এদেশীয় সংসারে বিড়ম্বনার কারণ তাহা ছাড়া আর কিছুই নয়। এদেশে স্ত্রীলোকেরা যদি লেখাপড়া শিখিত, সৎশিক্ষায় শিক্ষিতা হইত, যদি তাহাদের চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে তাহারা আমাদের অবস্থা বুঝিতে পারিত এবং সেইরূপ হইয়া চলিত, সংসারে বৃথা বিড়ম্বনার সৃষ্টি করিত না। বঙ্গসংসারে অশান্তি-অনল প্রজ্বলিত হইত না, আর এ সংসার-সমস্যাও লিখিতে হইত না। বঙ্গমহিলারা লেখাপড়া জানে না, সৎশিক্ষা পায় না, চিন্তা করিবার ক্ষমতা তাহাদের হয় না, তাহারা আমাদের এই দুর্দ্দিনে আমাদের দুরবস্থার বিষয়ও কিছু ভাবিতে বা বুঝিতে পারে না; কাজেকাজেই তাহারা কেবল মাত্র বাহিরের বাবুগিরি দেখিয়াই বিমোহিত হয় এবং যত বিড়ম্বনার সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমাদের ব্যয় যে বাড়িয়াছে, আয় যে বাড়ে নাই, আমরা যে ভিতরে বাহিরে সমান বাবুগিরি করিতে অক্ষম, আমাদের আয়ে যে সে ব্যয়

সঙ্কুলন হয় না, এই সামান্য বিষয়টুক তাহারা বুঝিতে অক্ষম এবং সেই জন্যই বঙ্গদেশে আজ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা এক মহা বিড়ম্বনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা লিখিতে পড়িতে জানে না, উচ্চ আদর্শে উচ্চ শিক্ষালাভ করিতে পারে না, বড় একটা ভাবিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই, তাই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা! সুতরাং বলিতেছিলাম, স্ত্রীলোকেরা উচ্চ শিক্ষালাভ করিলে আমাদের তাহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইবে। কেন না, তাহারা যদি লেখাপড়া করিতে শিখে, তাহারা যদি উচ্চ শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহারা যদি চিন্তা করিতে শিখে, তবে তাহারা আমাদের অবস্থা বুঝিতে পারিবে এবং অবস্থানুযায়ী চলিতে চেষ্টা করিবে। ইহা শুধু আমি নই, যে কেহ একটু সামান্য লেখাপড়া জানে ও যাহারই একটু ভাবিবার ক্ষমতা আছে, যে এদেশীয় সাংসারিক এবং সামাজিক মঙ্গল কামনা করে, দেশের এবং দশের উন্নতির আকাঙ্ক্ষী, সেই এই কথা বলিবে, ইহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু কোন্ জ্ঞানী, কোন্ জ্ঞানের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া স্ত্রীলোকদের উচ্চ শিক্ষার অপক্ষপাতী হইতে পারিলেন কিংবা পারেন তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। তবে হইতে পারে, কতকগুলি শিক্ষিতনামের কলঙ্কমাত্র থাকিতে পারে, যাহারা শুধু স্ত্রীমহলে প্রাধান্যতা বজায় রাখিবার জন্য স্ত্রীলোকদিগকে শুধু সাধের পোষা পাখী করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ রাখিয়া কেবল বিলাসবাসনারই পরিতৃপ্তি করিতে চা'ন। তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে বোধ হয় মানুষ বলিয়া মনে করেন না। স্ত্রীলোকও যে মানুষ এবং পুরুষের শক্তিস্বরূপিণী,

এ কথা তাঁহারা ভাষা, বুঝা ত দূরের কথা, ধারণাও করিতে সক্ষম ন'ন। স্ত্রীলোক তাঁহাদের সর্ব্বত্র সকল কর্ম্মে সহায়তা করিতে পারে, এরূপ কথা কখনও তাহারা সাহস করিয়া মনেই আনিতে পারে না! তাহাদের বিশ্বাস স্ত্রীলোক বিলাসের একটা বড় জীবিত সামগ্রী। সর্ব্বপ্রকার বিলাসের সামগ্রীর মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্য সমুদয় বিলাসের সামগ্রী তাহাদের আদেশ অনুযায়ী তাহাদের ব্যবহার দ্বারা তাহাদের বাসনা পূর্ণ করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের সহিত মিষ্ট কথা কহিয়া তুষ্ট করিতে পারে না। আর স্ত্রীলোক তাহাদের বাসনাও পূর্ণ করিয়া থাকে এবং দু'টা মিষ্ট কথা বলিয়া—একটা গান গাহিয়া—দু'একটি অঙ্গভঙ্গী করিয়া সব রকমে সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম। স্ত্রী তাই তাহাদের বিলাসোপকরণের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী। কিন্তু স্ত্রী তাহাদের কর্ম্মজীবনে সহধর্ম্মিণী, তাহারা—অর্দ্ধাঙ্গিনী—শক্তিরূপিণী—এরূপ ভাব তাহারা কোনও দিন কল্পনায়ও আনিতে পারে না। এই শ্রেণীর শিক্ষিতদিগকে আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কারণ, তাহারা বাস্তবিক শিক্ষিত নামের কলঙ্ক মাত্র। তাহারা ছাড়া আমার বিশ্বাস আর এমন কোনও শিক্ষিত ভদ্রলোক নাই, যাহারা স্ত্রীশিক্ষার অপক্ষপাতী অথবা যাহাদের উচ্চ শিক্ষাদানে কোন অমত আছে বা থাকিতে পারে। তবে, সাধারণতঃ এই হইয়া থাকে যে অনেকে ইচ্ছা থাকিতেও অবস্থাবিড়ম্বনার দরুণ আপনাদের মেয়েদিগকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা করিতে পারেন না, এমন কি, অনেকেরই পরিবারভুক্ত মেয়েদিগকে নিম্নশিক্ষা পর্য্যন্ত দিবার সুযোগ হয় না। এ সব স্বতন্ত্র কথা। অবস্থায় নেহাত

না কুলাইলে আর কি করা? তজ্জন্য গলায় তো আর দড়ি দেওয়া যায় না? কিন্তু যাহাদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, নিজের মত নাই বলিয়া, স্ত্রীশিক্ষার তিনি পক্ষপাতী নন, তবে তাঁহাদের লইয়াই কথা। তাঁহাদেরই সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা। কিন্তু আমার বোধ হয় এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম। অতএব সেই দিকে আর বিবেচনা নিষ্প্রয়োজন। স্ত্রীশিক্ষা নিতান্ত দরকার ইহা সকলেই বলিবে এবং তাহারা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া উন্নত প্রণালীতে ঘরকন্না করে ইহা সকলেরই বাঞ্ছনীয়।

স্ত্রী-শিক্ষায় চাই কি?

কিন্তু আ'জ কা'ল অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে যে, এই দেশী স্ত্রীলোকেরা অল্পবিস্তর লেখা পড়া শিখিয়াই "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" হইয়া উঠেন। "ক" না শিখিতেই কলম ধরিয়া কবিতা লিখিতে ধরেন এবং যা' তা' কিছু লিখিয়া অধিকাংশ সময়েই স্ত্রী-মহলের আসর গরম করিয়া উঠান। আ'জ কা'ল ইহা বড় বিড়ম্বনাজনক হইয়াছে। এই বিড়ম্বনা নিবারণ করিতে হইলে স্ত্রী-শিক্ষার একটা বিশেষ বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। ললনাগণ যাহাতে সুশিক্ষায় শিক্ষিতা হইতে পারেন তাহার বন্দোবস্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

কিন্তু তাহাদিগকে কিরূপ শিক্ষায় শিক্ষিতা হওয়া উচিত, তাহা বাস্তবিক ভাবিবার বিষয়। তাহাদের নিতান্ত অল্প শিক্ষার পরিণামে দেখিতেছি তাহারা পড়িতে শিখিয়া নাটক নভেল পড়িতে

আরম্ভ করিয়া নিজেদের মাথা বিগড়াইয়া দেয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সংসারের সুখ শান্তি সব উলট্‌ পালট্‌ হইতে থাকে। অন্য দিকে, উচ্চ শিক্ষাই বা কতদূর কি দেওয়া যাইতে পারে এবং এই দেশে এই সামাজিক রীত্যনুসারে কতদূর কি সম্ভবপর হইতে পারে, এই সব বিষয়গুলি সকলেরই একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা উচিত। তাহা হইলেই, ইহা বলা নিতান্ত কর্ত্তব্য যে, সর্ব্বাগ্রে 'দরকার' লইয়া কথা। আর যাহা কিছু ভাবিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে আমাদের 'দরকার' কি? এবং কতটা? কতদূর পর্য্যন্ত পড়িলে এবং কি কি বিষয় পাঠ করিলে আমাদের কাজ চলিবার মত হইতে পারে, তাহাই সকলের আগে দ্রষ্টব্য। সেই পর্য্যন্ত হইলে তৎপরে বিবেচনা করিতে পারা যাইতে পারিবে যে আর কতটা কি দরকার।

আমাদের এ'টী গরিবের দেশ। সুতরাং আমাদিগকে বিশেষ হিসাব করিয়া চলিতে হইবে। কোন জিনিষের অপব্যবহার না হয়, কেহ আমাদিগকে ঠকাইয়া না লইতে পারে, কিছু আমরা ভুল না করি এবং কোন কিছু হারাইয়া না ফেলি, এজন্য সতর্ক হওয়া দরকার এবং সেই জন্য সামান্যরূপ লেখা পড়া শিখিয়া আপন আপন কাজ কর্ম্মের হিসাব রাখা এবং কোন জিনিষ হারাইয়া না ফেলা সকলেরই পক্ষে প্রয়োজন। আ'জ কা'ল বাহিরের ব্যস্ততানিবন্ধন বাড়ীর পুরুষদিগকে প্রায়ই বাহিরে সময় অতি-বাহিত করিতে হয়, বাড়ীর কাজ কর্ম্ম দেখিবার এবং হিসাব পত্র রাখিবার সময় বড় একটা হইয়া উঠে না। সুতরাং বাড়ীর কাজ

কর্ম্ম এবং হিসাব পত্র রাখিতে হইলে বাড়ীর মেয়েদের সামান্যরূপ লেখাপড়া জানা নিতান্ত দরকার।

সন্তানদিগের প্রথম এবং প্রধান গুরু মাতা। শিশু সন্তান-দিগকে মাতা অতি সহজে অক্ষরাদি পরিচয় করাইয়া দিয়া অনেকটা অগ্রসর করাইয়া দিতে পারেন। শৈশব হইতেই যদি শিশুদিগের একটা পড়াশুনা করিবার অভ্যাস করিয়া দেওয়া যায়, তবে তাহা-দিগকে শেষে পাঠশালায় পাঠাইতে আর তেমন একটা বেগ পাইতে হয় না। অবশ্য এ দুনিয়াতে যে সকলেই লেখা পড়া শিখিয়া বড় বড় বিদ্বান্ হইতে পারিবে তাহার কোন মানে নাই। কিন্তু মাতা শিক্ষিতা হইলে সন্তানদিগকে শৈশবে অন্ততঃ সামান্যরূপ লেখা পড়া শিখাইয়া দিতে পারেন যে, তাহারা তাহাদের জীবন-পথে হিসাব পত্র রাখিয়া থাইতে পারে। অতএব মাতার লেখা পড়া জানা নিতান্ত আবশ্যক।

অতঃপর লেখা পড়া শিখিয়া পুস্তকাদি পাঠ না করিলে চিন্তা শক্তির ভালরূপ উন্মেষ হয় না। লেখা পড়া শিখিয়া পুস্তকাদি পাঠ করিলে পঠিত বিষয় ভাবিতে থাকে এবং ভাবিতে ভাবিতে চিন্তাশীলতা বাড়িয়া যায় এবং এই চিন্তাশীলতা সংসারীর পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। কেন না, গৃহিণী যদি চিন্তাশীল না হন, যদি সংসারের অবস্থা, স্বামীর অবস্থা বুঝিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে প্রায়ই সংসারে বিড়ম্বনা উপস্থিত হয়, সংসার প্রায়ই অশান্তিময় হইয়া উঠে। সুতরাং গৃহিণীর লেখা পড়া জানা নিতান্ত দরকার; কেন না, তাহার চিন্তাশীলতা সংসারধর্ম্ম পালনের পক্ষে অতি আবশ্যক।

আর তা'রপর যাঁহাদের অবস্থা ভাল, যাঁহাদের সংসারে অসংখ্য দাসদাসী কাজ করিতেছে, তাঁহাদের সংসারের স্ত্রীলোকদের ত লেখা পড়া না জানিলেই নয়। যদি তাঁহাদের প্রত্যেকটী কাজের জন্য, প্রত্যেকটী ফরমা'সের জন্য, বাড়ীর বাহির হইতে সরকার ডাকিয়া আনিয়া হিসাব লেখাইতে হয়, তবে সে এক বিষম বিড়ম্বনা।

যা'ই হো'ক, অন্ততঃ কতক পরিমাণে লেখা পড়া জানা সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে আজ কা'লকার বাজারে বড় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। প্রবাসী স্বামীর কাছে পত্র লিখিতে যদি অন্যের সাহায্য লইতে হয়, তবে তাহা বড়ই লজ্জার বিষয়। অথবা আপন বাড়ীর হিসাবপত্র লেখাইতেও যদি অন্যকে তোষামোদ করিতে হয় সেও বড় দুঃখের বিষয়। সুতরাং অল্প বেশী লেখা পড়া জানা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

এদেশীয় সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের নিম্ন প্রাথমিক অথবা বড় জোর উচ্চ প্রাথমিক পর্য্যন্ত পড়িলেই একরূপ কাজ চলিবার মত বেশ হয়। তাহারা যদি বেশ তাড়াতাড়ি লিখিতে এবং পড়িতে পারে, এবং হিসাবপত্র একরূপ রাখিতে সক্ষম হয় তাহা হইলেই হইল। উচ্চ প্রাথমিক পর্য্যন্ত প'ড়িলে সাহিত্যেরও সামান্য একটু পড়া হয়, ধারাপাত ও শুভঙ্করী শেষ হইয়া যায়, পরিমিতিরও দুই চারি পাতা পড়া হয়, আর সাধারণ রকম অঙ্কশাস্ত্রেও সামান্যরূপ অধিকার হয় এবং ইতিহাস, ভূগোল ও সরল বিজ্ঞানেও অল্প দখল জন্মে। উচ্চ প্রাথমিক পর্য্যন্ত পড়িলে সব বিষয়েরই

একটু একটু পড়া হয়। মানে, মোটের উপর, সমুদয় বিষয়েরই সামান্য আভাস মাত্র দেওয়া হয়। অতএব এই পর্য্যন্ত পড়িলে কাজ চলিতে পারে। সাধারণ গৃহস্থ স্ত্রীলোকের পক্ষে অন্ততঃ এই পর্য্যন্ত পড়িলেই একরূপ বেশ হয় বলিতে হইবে। সকলকেই সব বিষয়েরই কিছু কিছু আভাস দিয়া সকল বিষয়েরই আস্বাদ দেওয়া হইল। তখন যদি কাহারও সাধ হয় যে সে কোনও একটী স্বতন্ত্র বিষয় অধ্যয়ন করিবে, তাহা সে মোটামুটি বেশ পারিবে। এই পর্য্যন্ত পাঠ করিলে নানারূপ উপদেশপূর্ণ গ্রন্থসমূহ তাহারা অবাধে পড়িতে পারিবে, ইচ্ছামত ইতিহাস ও আর আর সদ্‌গ্রন্থ সমুদয় পাঠ করিয়া দেশের বিষয় জানিতে সক্ষম হইবে, এবং শেষে সন্তানদিগকেও শিক্ষিত করিতে বিশেষরূপে সাহায্য করিতে পারিবে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে দুই একখানা বই পড়িয়া শরীর রক্ষার বিশেষ নিয়মগুলি জানিয়া নিজেরা সেইরূপ চলিতে প্রয়াস পাইতে পারিবে, এবং সন্তানদিগকেও সেই প্রকারে চালাইতে প্রয়াস পাইতে পারিবে। যাহাই হউক, আসল কথা এই যে, মোটের উপর এই পর্য্যন্ত পাঠ করিলেই বেশ চলিবার মত হইতে পারে এবং তাহা হইলেই যথেষ্ট। তারপর যাহাদের ইচ্ছা এবং অবস্থা আছে, তাহারা যতদূর পর্য্যন্ত ইচ্ছা পড়াশুনা করিতে পারে এবং যথা-সম্ভব জ্ঞান লাভ করিতে পারে। কিন্তু সাধারণের পক্ষে এই পর্য্যন্ত হইলেই বেশ হয়—এক রকম বেশ দেখিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া যাহা হয় করিতে সক্ষম হয়, কারণ, তখন একটু ভাবিবার ক্ষমতা হয়।

এই পর্য্যন্ত হইল স্ত্রীলোকদিগের স্কুলে পড়াশুনা সম্বন্ধে।

কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে—কেবল স্কুলের বিদ্যায়ই স্ত্রীশিক্ষা শেষ হয় না, অন্ততঃ এ দেশেত নয়। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে স্কুলের শিক্ষা অপেক্ষা ঘরের শিক্ষা কম নয়। ঘরকন্না করিতে অনেক জিনিস শিখিবার দরকার। সে সব আমাদের দেশে ঘরেই শিখিয়া থাকে। মাতা, ঠাকুরমাতা, পিসীমাতা কিংবা মাসীমাতা যিনিই সংসারে অভিভাবিকাস্বরূপ থাকেন তাঁহারই নিকটই যাবতীয় গৃহ-কর্ম্মাদি শিখিয়া থাকে এবং সাধারণতঃ তাঁহারই চরিত্রানুযায়ী গঠিত হইয়া থাকে। এইরূপে মেয়েদের চরিত্র গঠন হওয়াতে ফল প্রায় সব সময়ই ভালই হইত। কিন্তু এখন এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়াতেই আজ কাল এই বিষময় ফল দাঁড়াইতেছে। মানে, আজ কাল মেয়েরা অল্প বয়সেই পাঠশালাতে যাওয়াতে এখন আর তাহারা পূর্ব্বরূপ গৃহ-শিক্ষা গ্রহণ করে না, কিন্তু অন্য দিকে পাঠশালাতেও তাহাদের কাজ কর্ম্ম শিখিবার বা চরিত্র-গঠনের সেরূপ কোনও ব্যবস্থা না থাকাতে তাহাদের চরিত্র গঠনের দিক্‌টা একরূপ আঁধার হইয়াই পড়িয়া থাকে এবং তাহারই ফলে আজ তাহারা যাহা, ঠিক তাহাই। সাংসারিক অশান্তির ইহাই মূল কারণ। কিন্তু সংসারীদের পক্ষে স্ত্রীলোকদের স্বভাবই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য বিষয়। কেন না, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সকলেই যে জ্ঞানবিজ্ঞানের আরাধনা করিবে এবং তাহাতে যে সুখ পাইবে তাহাই যে যথেষ্ট, তাহা কখনও নহে; প্রায় সকলকেই সংসার করিতে হইবে এবং সংসারের সুখে সুখী হইতে হইবে। সুতরাং যাহাতে তাহারা তাহাতেই অধিকতর সুখী হইতে পারে

তাহাই করা কর্ত্তব্য। আর সেই সুখে সুখী হইতে হইলে তাহাদের চরিত্র এ দেশ অনুযায়ী হওয়া উচিত। অতএব সর্ব্বপ্রথমে যাহাতে তাহাদের চরিত্র গঠিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

কিন্তু এই শিক্ষা দেওয়া আজ কাল একটু কঠিন কথা। কারণ, আজকাল তাহাদিগকে প্রথম পাঠশালায় যাইতেই বিদেশী হাওয়া গায়ে লাগাইতে হয়। পাঠশালায় যাইতেই বিদেশী ভাবের অনুকরণে বিদেশী ভূষায় ভূষিত হইয়া যায়। এখন অভিভাবকদেরই অভিমত তাই। তবুও, যা'ই হো'ক, যতটা সম্ভব চেষ্টা করিতে হইবে, যতটা সম্ভব তাহাদিগের প্রাণটা সব দেশী রসে সিক্ত রাখিতে হইবে। তাহারা অক্ষর চিনিয়া কোনও রূপে পড়িতে পারিলেই এদেশী আদর্শ রমণীদিগের চিত্রগুলি এক এক করিয়া তাহাদের সম্মুখে ধরিতে হইবে। তাহাদের সাহিত্য সমুদয় এই সব বিষয়েই পরিপূর্ণ হওয়া দরকার। তাহারা যদি প্রথমে এই সমুদয় বিষয়-গুলি পড়িতে থাকে এবং গল্পচ্ছলে প্রতিদিন ইহাদের এক একটী গুণ-গাথা শিক্ষক কিংবা শিক্ষয়িত্রীর মুখে শ্রবণ করিতে থাকে, তবে তাহারাও তাহাদের চরিত্র ঐ সমুদয় আদর্শ অনুযায়ী গঠন করিতে প্রয়াসী হইবে এবং তাহা হইলেই তাহাদের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু ভাবিতে হইবে না। আর যখন তাহাদের আদর্শ একরূপ ঠিক হইয়া গিয়াছে এবং চরিত্র একরূপ গঠন হইয়া গিয়াছে, তখন বিদেশী আদর্শ যদি দরকার হয় তবে তাহাদের সম্মুখে ধরিলেও আর তেমন কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিতে পারিবে না। কারণ,

তখন তাহারা ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, এবং ন্যায় অন্যায় বুঝিয়া লইতে সক্ষম। সুতরাং যাহাতে যেটুকু ভাল কিংবা গ্রহণীয় তাহা হইতে তাহা বাছিয়া লইয়া গ্রহণোপযোগী হইলে গ্রহণ করিবে এবং যাহা গ্রহণযোগ্য নহে তাহা পরিত্যাগ করিবে। মানে, তখন আর ভয় করিবার কিছু থাকিবে না; কারণ, তখন তাহারাই ভাল করিয়া বুঝিয়া কাজ করিতে সক্ষম হইবে। অতএব অন্য শিক্ষার পূর্ব্বে যাহাতে তাহাদের চরিত্র গঠন করিবার পক্ষে সুবিধা হইতে পারে সেই সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করা প্রথমে কর্ত্তব্য। কেন না, এদেশী স্ত্রীলোকেরা যাহাতে এদেশী ভাবে অনুপ্রাণিতা হয় এবং এদেশী ছাঁচে ও এদেশী ধাঁচে গঠিত হয় এবং এদেশী সভ্যতার অনুগামিনী হয়, তাহাই করিতে হইবে। কারণ, তাহা না হইলে এদেশে আমাদের এরূপ অবস্থায় সংসার করিতে তাহাদের অতিশয় কষ্ট হইবে, অথবা যেরূপ আজকাল হইতেছে, আমাদিগের পক্ষে সংসারে সংসারী হওয়া মহা কষ্টকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে চরিত্র শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই দেশের অবস্থা আস্তে আস্তে ফিরিতে থাকিবে, বঙ্গ-সংসারে আবার শান্তিদেবী ফিরিয়া আসিবেন।

শিক্ষিত হইয়া তাহারা আবার "বাবু" বনিয়া না যায় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই আর স্ত্রী-শিক্ষা লইয়া কোন কথাই হইবে না এবং যদিও দুই একজন স্ত্রী-শিক্ষার অপক্ষপাতী থাকিয়া থাকেন, তাঁহারাও তাহা হইলে নিরব হইবেন। সুতরাং এদিকে লক্ষ্য রাখা তাঁহাদের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। তাঁহারা

যদি ইহাই মাত্র করিতে পারেন, তবে তাঁহারা দেখিবেন এ ভারত-বর্ষে কেহই আর তাঁহাদের উন্নতির পক্ষে বাধা দিবার রহিবে না। অতএব মিছামিছি স্বাধীনতা কিংবা মনুষ্যাধিকারের দাবী না করিয়া তাঁহাদের এই কর্ত্তব্য যদি তাঁহারা পালন করেন, তাহা হইলেই তাহারা দেখিতে পাইবেন যে তাহাদের উন্নতির অপক্ষপাতী কেহই নয়। আর তাহা না করিয়া যদি বৃথা গোলমাল করেন, তাহা হইলে সকলেই স্ত্রী শিক্ষার অপক্ষপাতী হইবে। কেন না, লেখাপড়া শিখাইয়া স্ত্রীলোকদিগকে "বাবু" বানাইয়া দিয়া আপন ঘরে নিত্য অশান্তিকে আহ্বান করা কাহারও বাসনা হইতে পারে না। কে অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করিয়া অনর্থ কিনিতে চায়?

কিন্তু বর্ত্তমানে হইতেছেই সেইরূপ। আজকাল প্রতি সংসারে অশান্তি-অনল জ্বলিবার কারণই তাই। এই "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী"-গণই বঙ্গীয় সংসারে অশান্তি সৃষ্টির কারণ। কেন না, বঙ্গললনাগণ যদি অল্পবুদ্ধা না হইত, যদি তাহারা—"অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" না হইত, এবং যদি তাহারা বিদেশী আলোকের চমকে দিক্ না ভুলিত এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান-বিরহিত না হইত, যদি তাহারা দেশের অবস্থা বুঝিতে পারিত, তবে আর বঙ্গসংসার এরূপ অশান্তিময় হইত না। তাই বলি দুঃখই ত ঐ—

বঙ্গললনারা দেশের অবস্থা বুঝেন না।

দেশের আ'জকাল অবস্থা কি, দেশের অবস্থা যে দিন দিনই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে, প্রতিদিনই যে দেশী লোকের

গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করা ক্রমেই ভয়ঙ্কর সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইতেছে এ সব বিষয় এ দেশী স্ত্রীলোকেরা একবার ভাবিতেও পারে না। উপার্জ্জনের অবস্থা যে দিন দিনই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে, এ বিষয় কখন তাহাদের কল্পনায়ও আসে না। অবশ্য, বলা বাহুল্য, দেশের আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। দেশে আজকাল যথেষ্ট অর্থের আমদানী হইয়াছে এবং দেখিতেছি আমরা জুতা, জামা, মোজা ইত্যাদি পরিতেছি, হ্যাট কোট্ লাগাইতেছি, টেরি কাটিয়া ছড়ি হাতে করিয়া জুড়ী গাড়ী হাঁকাইতেছি কিংবা অন্তরঙ্গকে সঙ্গে লইয়া মোটরকারে চাপিয়া সান্ধ্য হাওয়া লাভের অভিলাষে গড়ের মাঠ, ইডেন গার্ডেন অথবা গঙ্গার ধারে বেড়াইবার সুযোগ পাইয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঠিক আমাদের অবস্থাটা কি? এ সবই ত আছে, তবু আমাদের ঘরে শান্তি নাই কেন? দেশে এ'ত টাকা, এত কড়ি, এত গাড়ী, এত জুড়ী, এত ধন, এত দৌলৎ তথাপি দেশের হাহাকার রব ঘুচে না কেন? দেশে শান্তি নাই কেন? আ'জ আমরা এত উন্নত তবুও আমাদের ভাই ভা'য়ে ঐক্য নাই কেন? ভা'য়ে ভাইয়ের জন্য দাঁড়ায় না কেন? ভাই ভা'য়ের জন্য কাঁদে না কেন? ভাই ভা'য়ের বিপদে পাশে আসিয়া দাঁড়ায় না কেন? এ সব প্রশ্ন কখনও আজকালের বঙ্গীয়া স্ত্রীলোকদের অন্তরেই উদয় হয় না। আ'জ আমরা লেখাপড়া শিখিয়াছি, আইন পড়িয়াছি, কলম ধরিয়াছি, জ্ঞানলাভ করিয়া কত কি হইয়াছি—কিন্তু, হায়, তথাপি কেন, এমন কি, সামান্য এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়া

দারিদ্র-প্রপীড়িতা মায়ের চক্ষের জল দূর করিতে পারিতেছি না? হায় বিধি! এই কি তোমার বিধি? এই কি স্বর্গীয় সুব্যবস্থা? ধিক্, শতধিক্ এমন শিক্ষায়, এমন সভ্যতায় এবং উন্নতিতে! আর হাজার ধিক্ সেই স্বর্গীয় সুব্যবস্থায়। এমন শিক্ষা, এমন সভ্যতা, এমন জ্ঞানলাভ, এমন উন্নতি এবং এমন সুব্যবস্থা চাই না। যে শিক্ষা, যে সভ্যতা ও যে জ্ঞানলাভের দ্বারা সংসারে একমাত্র আরাধ্যা সাক্ষাৎ দেবী জননীকে এক মুষ্টি মাত্র অন্নের সংস্থান করিয়া দিতে সক্ষম করে না, ধিক্ সে শিক্ষা, সে জ্ঞানলাভ, ও সে উন্নতিকে! যে শিক্ষা মাতৃপূজার সহায়তা করে না, ধিক্ সে শিক্ষায়! যা'ই হো'ক, বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থা যে কিরূপ, আমরা যে এখন কিরূপ সমস্যায় পড়িয়াছি, এ সব বিষয় কিছুই বঙ্গীয়া স্ত্রীলোকদের ভাবিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহারা এ সব ভাবেন না।

এ সব তাঁহাদের জানা উচিত এবং ভাবা উচিত।

বাঙ্গালায় বনিয়াদি বড় মানুষের সংখ্যা দিন দিনই হ্রাস হইতেছে। যাহারা—"মাইটের" জোরে রাইট কিনিয়া আসিয়াছিলেন, মানে সৎবুদ্ধি এবং নিজ বাহুবল ও সৎসাহস এবং অধ্যবসায়ের যোরে বড় মানুষ হইয়াছিলেন, আ'জকাল তাহাদের অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিতেছে এবং দিনদিনই তাহাদের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। এবং অন্যদিকে কতকগুলি নীচ ঘৃণিত বৃত্তিদ্বারা অর্জ্জিত ধনসম্পদ্ সম্পন্ন নূতন বড় মানুষের বাঙ্গালার কর্ম্মক্ষেত্রে আমদানী হইতেছে। দিন দিনই দেশের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে।

বাঙ্গালায় বনিয়াদি বড় মানুষের অবনতি বাঙ্গালার পক্ষে কম

দুঃখের কথা নয়। কেননা, এই সকল বড় লোকেরা বড় হইয়া যে নিজেদেরই উদর পূর্ত্তি করিত কিংবা নিজেদেরই কেবল সুখ সুবিধা দেখিত তাহা নহে, তাহাদের বড় মানুষীতে অন্য দশজন উন্নত, প্রতিপালিত এবং সুখী হইত। তাহাদের সাহায্যে বিদ্যোৎসাহীদের বিদ্যালাভ হইত, শিল্পজীবিদের শিল্পের উন্নতি হইত, ব্যবসায়ীদের টাকার অভাবে ব্যবসা বন্ধ থাকিত না। তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষমতানুযায়ী এ সমুদয়কেই সাহায্য করিতেন, ইহারাও উৎসাহিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সানন্দে সম্পাদন করিত এবং তাই তখন দেশে শিল্প বাণিজ্য সুন্দরভাবে চলিত। বড় মানুষদের আশ্রিতেরা নানারূপ কার্য্যের দ্বারা প্রতিপালিত হইত, বাঙ্গালায় অশান্তির মূর্ত্তি দেখা যাইত না। প্রতি ঘরে ঘরে শান্তি-দেবী প্রতিনিয়ত বিরাজমানা থাকিতেন। বাঙ্গালীরা হাহাকারের তেমন একটা ধার ধারিত না। শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির সুবিমল শান্তিধারা শরীরে বহিত, তাহারা সদাসর্ব্বদা সুখে কাল যাপন করিত। সেইদিনের বড় মানুষদের দ্বারা দেশের এতটা হইত! আর আজকালের নূতন বড় মানুষ বাবুদের দ্বারা কি হয়? বারাঙ্গনার বিড়ালের বাবার শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ব্যবসায়ী কিংবা শিল্পী অথবা শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের বাড়ীর ত্রিসীমানার ধার দিয়া যাইতে পারে না! তাহারা রাশী রাশী স্তূপ স্তূপ অর্থব্যয়ে রায় বাহাদুরাদি অন্তঃসারশূন্য অনাবশ্যকীয় উপাধি ক্রয় করিবেন কিন্তু দেশী শিল্পের উন্নতি করা দূরে থাক, তা'র বাপের শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাধা করিয়া কায়মনোবাক্যে বিদেশী পণ্যের যথা সম্ভব—যথা বিহিত কাটতি

করাইতে প্রয়াস পাইবেন। কিন্তু চাটুকারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সভাসমিতেতে তাঁহারা খাঁটী স্বদেশী সাজিয়া সুদীর্ঘ সুললিত বক্তৃতা দ্বারা বেশ দু'চা'রটা বাহাদুরী লইতে ছাড়িবেন না। ইহাদের দ্বারা কেবল চাটুকার এবং "পেশাকার" এই দুই জাতীয় লোকছাড়া দেশের কিংবা দশের প্রকৃতপক্ষে কোনই উপকার হইবে না। কাহারও কোন উপকারের আশা তাহাদিগের দ্বারা অসম্ভব।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালায় শিল্পের অভাব সর্ব্বত্রই পরিদৃশ্যমান। বাজারে বিদেশী দ্রব্যেরই প্রায় পৌনে ষোলআনা আমদানী। এমন কি জাপানও এখন তাহার পণ্য দ্রব্য আনিয়া এদেশী বাজারে বেশী হাতে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু দেশী শিল্পের আজও একবারেই অভাব। দেশে কি শিল্পীর অভাব? না, এরূপ অনুমান করিলেও নিতান্ত অন্যায় করা হয়। এদেশে শিল্পজীবীর অভাব নাই, অনেক আছে। কিন্তু কথা এই, তাহাদের উৎসাহিত করে কে? তাহারা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে এবং যে যাহা কিছু করিয়া নিজ নিজ উদরান্নের সংস্থান করিতেছে। তাহাদের সাহায্য করে কে? অতএব, এদেশে, বাস্তবিক পক্ষে, শিল্পজীবীর অভাব নয়, অভাব যাহারা তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবে—অভাব বনিয়াদি বড়মানুষদের। দেশের নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে অভাব এখন সেই সহৃদয় প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক বনিয়াদি বড় মানুষদের। বাগানে ফুল ফুটাইতে গাছে রীতিমত জল দেওয়া চাই এবং তজ্জন্য উপযুক্ত মালীর দরকার। চোর, ছেঁচড়, জুয়াচোর, বদ্‌মায়েস কিংবা অকর্ম্মণ্যের কাজ নয়। সেরূপ মালীও আ'জকাল নাই, এদেশী বাগানে

বর্ত্তমান সময়ে তেমন ফুলও ফুটে না। দেশে আর তেমন সহৃদয় স্বদেশপ্রেমিক বড় মানুষও নাই, স্বদেশী শিল্পজীবীরা আর তেমন সহায়তাও পায় না, তাহাদের শিল্পও তেমন সুপরিচালিত এবং বর্দ্ধিত হয় না এবং ফলে—দেশী শিল্প এবং শিল্পী উভয়েই যেন একবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

কৃষি।

তারপর কৃষি। দেশে কৃষির অবস্থা আজকাল ভাল নয়, বরং অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত। কেন না, একেত সেই পুরাণকালের পুরাণ উপায়ে চাষবাস, তা'রপর আবার সেই দৈবদেয় বর্ষার উপর নির্ভর! কোন বৎসর বা একবারেই জল হইল না, কোন বৎসর বা অসময়ে হইল, আবার কোনও বৎসর হয়ত একেবারে ভাসাইয়া দিল—বীজ শস্য পর্য্যন্ত ঘরে আসিল না। কৃষক একবারে অকূলে ভাসিল—একবারে নিরুপায়!

আরও একটী কথা। এ দেশের মাটীর সার কি আর ফুরায় না? এ মাটী কি আর অসার হইতে জানে না? আর না হয় স্বীকার করিলাম যে প্রতিবৎসর জলপ্লাবনে দেশ ডুবিয়া যাওয়ায় বাঙ্গালার মাটী প্রতি বৎসরই নূতন সার পাইয়া থাকে, কিন্তু তথাপি বৎসর বৎসর বাঙ্গালার জনসংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে সেরূপে যাহাতে বাঙ্গালার মাটী দ্বিগুণ পরিমাণে সার সংযুক্ত হইয়া আরও বেশী পরিমাণে শস্য প্রসব করিতে পারে সেরূপ চেষ্টা করা কি ভাল নয়? কিন্তু "কাহার বা মাথার ব্যথা, আর কেই বা দেবে

ঔষধ বেটে।” তবু বাঙ্গালায় যে পরিমাণ যাহা শস্য জন্মিতেছে, ব্যবসায়ীরা অর্থের জোরে দরিদ্র কৃষকের নিকট হইতে তাহা কিনিয়া লইয়া বিদেশে রপ্তানী করিতেছে আর এদিকে দেশের লোক হাহাকার করিতেছে। আর এ দেশে কৃষির উপর বাস্তবিক আজকাল বড় বেশী জুলুম করা হইতেছে। শুধু তা'ই নয়, ইহার উপর আবার শাকের আটী! একেই ত কৃষির উপর অতি বেশী, এখন আবার তাহার উপরও এক ডিগ্রি! এখন সমুদয় চাকরীজীবিগণও ব্যবসা হারাইয়া কৃষির উপর অনুগ্রহ করাতে এ বৃত্তির উপর চাপ আরও এক ডিগ্রি বেশী পড়িয়াছে এবং বর্ত্তমানে $\frac{১}{২}$$\frac{১}{০}$ ভাগে ঠেকিয়াছে; কিন্তু কৃষির আর কুলায় কত!

তবে শ্রমজীবীদের অবস্থা যেন, যদিও প্রায় বহন করাই সার, তথাপি, একটু উন্নত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। শ্রমজীবিগণ উত্তরোত্তর বেশ উন্নতি করিতেছে, এইরূপই মনে হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, পেটের দায়, তাহারা পেটের দায়েই কায়িক পরিশ্রম করিতে স্বীকৃত হয়; নিতান্ত পক্ষে উদরান্নের সংস্থানের উপায় তাহাদের চাইই। আ'জ কা'ল খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে তাহারাও দেখিয়া শুনিয়া ঠিক বুঝিয়াছে এবং তদনুযায়ী তাহাদের পরিশ্রমের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেছে। এইটুকু করিবার তাহাদের অধিকার আছে এবং তা'ই তাহারা এই বাজারেও উত্তরোত্তর একটু একটু উন্নত হইতেছে। কিন্তু মধ্যবিত্তদেরই নিরুপায়। তাহাদের পক্ষে আ'জ এই জগৎ সুখের ছাড়া অন্তরূপ। কেন? এই “কেন”র উত্তর আর বলিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, সকলেই অনায়াসে ইহা

অনুভব করিতে এবং বুঝিতে পারেন। এদেশে বড় এবং একেবারে ছোট উভয়েরই একটা না একটা গতি আছে। বড় যে তা'র ত কোন ভাবনাই নাই, মানে সেত বড়ই—তাহার ত আছেই, অথবা দরকার হইলে যেরূপে হো'ক, অন্যের মাথায় হাত বুলাইয়াই হো'ক বা পরের শোণিত শোষণ করিয়াই হউক, অথবা অনুগত অধীন জনগণের পকেট হইতেই হো'ক, অর্থের যোগাড় হইবেই; তাহাদের কোন কিছুতেই বড় একটা কিছু আসে যায় না। তৎপর ছোটদের কথা। তাহাদেরও মুস্কিল কিছুই নাই, ইচ্ছা করিলেই যে কোন কাজ হইতে হো'ক, শরীর খাটাইয়া দুইপয়সা আনিয়া উদর পূর্ত্তি করিতে পারে। কিন্তু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, যাহাদিগকে সাধারণতঃ এদেশে জনসাধারণ বলিয়া থাকে, তাহাদের অবস্থা আ'জ বড়ই ভীষণ। সঙ্গতি একবারেই নাই, অথবা অতি সামান্য মাত্র আছে, কিন্তু প্রাপ্ত সামান্য মাত্র অর্থের সদ্‌গতির পথ অনেক। আয়ের পথ অতি অপ্রশস্ত, কিন্তু ব্যয়ের পথ খুবই সুপ্রশস্ত। রোজগারের পথ অতি কম, কোন দিকেই বাড়িতেছে না, কোন দিকেই কোনরূপ নূতনরূপ আসার উপায় নাই, কিন্তু খরচ চাই ই!

দেশের এই সব অবস্থার বিষয় এ দেশী স্ত্রীলোকেরা একবার চিন্তা করিতেও অক্ষম। তাহারা কখন ভুলেও ভাবে না আমরা কেমন আছি! কিন্তু বিদেশী সভ্যতার আলোকে আলোকিত হইয়া "এ'টা দাও ও'টা দাও" করিয়া এই অনাটনের সংসারে কেবল মিছামিছি অনর্থ ঘটায়। তাহারা যদি সৎশিক্ষায় শিক্ষিতা হইত উচ্চ শিক্ষায় ভূষিতা হইত, তাহা হইলে তাহারা দেশের কথা ভাবিত, দেশের

অবস্থা বুঝিত এবং আমাদেরই আয় বৃদ্ধির পথ কত অপ্রশস্ত তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিত, বৃথা আব্দার করিয়া অনর্থ ঘটাইত না। বঙ্গসংসারে অশান্তি অনল আজ জ্বলিয়া উঠিত না এবং এদেশে আ'জ সংসার করাও এমন সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইত না। সতীরা তাহা হইলে পতির অবস্থা বুঝিতেন, পতির দুঃখে দুঃখিতা হইতেন, পতির মনের ভাব বুঝিতে পারিতেন—পতিকে বৃথা উৎপীড়ন করিতেন না। ক্লান্ত পতি সমস্তদিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাবেলা বাড়ী পৌঁছিলে তাহাদিগের শ্রান্তিদূর করিবার প্রয়াস পাইতেন, আপনাদিগের অভাবের অভিযোগ তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতেন না। তাঁহারা পতিপ্রাণা হইতেন। পতির প্রাণের কথা, মনের ব্যথা, খুঁজিয়া বাহির করিতেন এবং অন্ততঃ সহানুভূতি দেখাইয়াও সন্তুষ্ট করিতেন। পতি শত ক্লান্তি সত্ত্বেও তাহার শিষ্ট ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতেন, তাহার হাসিমুখ দেখিয়া সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া যাইতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে বঙ্গসংসার কি সেইরূপ? আ'জ কা'ল কি বঙ্গবধূরা স্বামীর অন্তরের কথা—প্রাণের ব্যথা, এবং অভাবের অনুশোচনা এ সব বুঝিতে পারে? না—আজ অন্যরূপ। আ'জ তাহারা আপনা লইয়া ব্যস্ত। আপনার অসুখ, আপনার অভাব, আপনার আব্দার, এই সব লইয়া তাহাদিগকে অতিশয় ভাবিতে হয়। স্বামী সমস্তদিন পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত কলেবরে গৃহে ফিরিলেন, হয়ত তাঁহার অসুখ হইয়াছে। কিন্তু গৃহিণী সে দিকে অবলোকন করিলেন না, স্বামী কেমন আছেন বারেক ভাবিলেনও না, তাহারই সারাদিনের অসুবিধার বিষয় তাঁহার নিকট বর্ণনা

করিতে লাগিলেন। স্বামী হয়ত অসুস্থতা নিবন্ধন অশান্তি অনুভব করিতেছেন, কিন্তু সেদিকে তাহার দৃষ্টিমাত্র নাই, তিনি তখন তাঁহার নিকট তাহার অভাবের তালিকাগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। স্বামী হয়ত অধীর অশান্ত হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু সেদিকে স্বামি-সোহাগিনীর ভ্রূক্ষেপও নাই, তিনি তখন তাহার নিকট নানা বিষয়ের আব্দার করিতে লাগিলেন। আর স্বামী যদি একটু বিরক্ত হইয়া তাহার শিক্ষার্থে দু'একটী কথা বলিলেন, সাবিত্রী তখন শ্যামামূর্ত্তি ধারণ করিয়া যাহা ইচ্ছা দাবী করিতে লাগিলেন। এটি কি ভাব! একি বিষম! একি ভয়ানক! এ যে ঠিক "তুমি মর বা বাঁচ, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই, আমার গুপ্তবার্ত্তা শুনিতেই হইবে" সেইরূপ। একটী গল্প আছে;—কোন একটী রাজা একজন মহা-পুরুষের বরে সর্ব্বপ্রকার জীব জন্তুরকথা শুনিতে পাইতেন এবং তাঁহাদের ভাষা বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু তাহার প্রতি মহাপুরুষের আদেশ ছিল যে তিনি সেই কথা কাহারও নিকট বলিতে পারিবেন না। যদি কখনও তাহা ব্যক্ত করেন তবে তিনি তন্মুহূর্ত্তে মারা যাইবেন। যা'ই হো'ক, একদিন রাজা যখন আহার করিতে বসিয়াছেন এবং রাণী স্বয়ং পরিবেষণে নিযুক্তা তখন এক অভাবনীয় ঘটনার সংঘটন হইল। রাজার নিয়ম ছিল প্রতিদিন সর্ব্বপ্রথমে তিনি ঘি ভাত খাইতেন এবং তৎপর অন্য যাহা কিছু তাহা গ্রহণ করিতেন। কিন্তু ঐ দিন রাণী পরিবেষণ করিতে আসিয়া ভাল-বাসিয়া রাজাকে ঘি'র পরিবর্ত্তে খাঁটী সরিষার তৈলে ভাত মাখিয়া দিয়াছিলেন, এবং রাজাও সানন্দে ভোজন করিতেছিলেন।

ইতিমধ্যে দুই চারিটা পিপিলীকা আসিয়া প্রত্যেক দিনের ন্যায় সেই তৈল মাখা ভাতের যে দুই চারিটা মাটীতে পড়িয়াছিল তাহা যেমন ধরিতে লাগিল অমনি তাহারা ভাত মুখে করিয়াই ভূতলে পড়িতে লাগিল এবং তাহা দেখিয়া আর যাহারা আসিতেছিল তাহারা ফিরিয়া যাইতে লাগিল এবং তাহাদের পরে যাহারা আসিতেছিল তাহারা তাহাদের শুধুমুখে প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিতে লাগিল,—ভাই, রাজা আ'জ আমাদিগকে ফাঁকি দিয়াছে! আ'জ রাজা সরিষার তৈল দিয়া ভোজন করিতেছেন এবং আমাদের দু' চা'র জন যাহারা হঠাৎ যাইয়া সেই তৈল মিশ্রিত ভাত ধরিয়াছে, তাহারা প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।" এইরূপ সংবাদে যাহারা আসিতেছিল তাহারা সকলেই দুঃখিত চিত্তে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। এ দিকে রাজা মহাপুরুষের বরানুযায়ী তাহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আপন মনে হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সেই অন্তরের হাসি অধরে প্রস্ফুটিত হইল এবং অদূরে অবস্থিতা রাণী তাহা দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার হাসিবার কারণ অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু রাজা কারণ বলিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহার মনে আরও সন্দেহ হইল। তিনি ভাবিলেন, আমি স্বয়ং পরিবেষণ করিতেছি, আজ রাজা তাহাতে হাসিলেন! হাসিবার কারণ অবশ্য জানিতে হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি পুনরায় রাজাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজাও পূর্ব্ববতই কারণ প্রকাশ করিতে অস্বীকৃত হইলেন, রাণীর সন্দেহ আরও বাড়িয়া চলিতে লাগিল। কারণ

জানিতে তিনি দৃঢ় পণ করিলেন। সুতরাং পুনঃ পুনঃ রাজার নিকট তাঁহার হাসিবার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাজা বেগতিক দেখিয়া অগত্যা বলিলেন ;—"কারণ শুনিয়া তোমার কাজ নাই, কেন না, তাহা বলিলে আমি বাঁচিব না—এই মুহূর্ত্তেই আমাকে মরিতে হইবে।" রাণী তদুত্তরে কণামাত্র বিচলিত না হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "তুমি মর তাহাতে আমার ক্ষতি নাই, কিন্তু কারণ আমার শুনিতেই হইবে।" রাজা তাহার সে মন্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ রাণীকে তাঁহার পণ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাণী অচল, অটল! তাহার মন একটুও নরম হইল না, তাহার প্রতিজ্ঞা টলিল না, তিনি ঠিক্ পূর্ব্ববৎ দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, "হাসির কারণ আমার শুনিতেই হইবে।" রাজা তখন নিরুপায় হইলেন ; এবং মরিতেই হইবে নিশ্চয় জানিয়া তিনি তখন যাহাতে তিনি গঙ্গাতীরে গঙ্গাজলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন সেইরূপ করা বিধেয় মনে করিয়া রাণীর নিকট প্রস্তাব করিলেন "যদি মরিতেই হয়, যদি তুমি নিতান্তই আমার হাসির কারণ জানিতে চাও, তবে চল আমরা গঙ্গাতীরে যাই। আমি গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া তোমার নিকট সেই গুপ্তকথা ব্যক্ত করিব এবং গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া আমার এই দেহের অবসান করিব।" রাণী তাঁহার এই প্রস্তাবে অসম্মতা হইলেন না, ইহাতে অনুমোদন করিলেন। অতঃপর তাঁহাদের গঙ্গা-তীরে যাইবার ব্যবস্থা হইল। রাজা এবং রাণী গঙ্গাতীরে যাইবেন অচিরে এ সংবাদ রাজ্য মধ্যে বিঘোষিত হইল এবং ইহাও প্রচারিত

হইল যে রাজা রাণীর নিকট কি এক গুপ্ততত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গঙ্গাতীরে গঙ্গানীরে দেহাবশান করিবেন। এই দুঃসংবাদ পাইয়া রাজ্যের প্রজা সমুদয় বড়ই মর্ম্মব্যথা অনুভব করিতে লাগিল। উজির, নাজির, ইহারা রাণীকে পণ পরিত্যাগ করিতে বলিতে লাগিলেন। কিন্তু রাণী পূর্ব্ববৎ দৃঢ়তার সহিত তিনি "কারণ শুনিবেনই শুনিবেন" এরূপ প্রকাশ করিলেন। অবশেষে মন্ত্রিগণও তাহার নিকট পরাস্ত হইল। সুতরাং অবশেষে রাজার গঙ্গাতীর-যাত্রারই বিধান হইতে লাগিল, দুই একদিন মধ্যেই সমস্ত যোগাড় হইল। রাজা এবং রাণী লোকজন সমভিব্যাহারে অনতিবিলম্বে গঙ্গাতীরে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু রাজপুরী হইতে দিনেকের পথ অতিক্রম করার পর রাজার মলত্যাগ করার নিতান্ত দরকার হইল। সুতরাং বাহিনী তথায় বিশ্রামার্থে বসিয়া পান তামাক খাইতে লাগিল, আর রাজা জলপাত্র লইয়া অদূরে ঝোপের আড়ালে মলত্যাগ করিতে গেলেন। তথায় এক আশ্চর্য্য ঘটনার সম্ভাবনা হইয়া পড়িল। তিনি যেখানে মলত্যাগ করিতে বসিয়াছেন তাহার পার্শ্বে একটী ছোট গর্ত্ত ছিল এবং সেই গর্ত্তে এক জোড়া ব্যাং বাস করিতেছিল। রাজা মলত্যাগ করিতে করিতে শুনিতে পাইলেন গর্ত্তমধ্যে ভেক ও ভেকী আলাপ প্রলাপে নিযুক্ত। তাহার মন তখন সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। রাজা তখন তাহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন :—ব্যাঙ্গী—দেখ ব্যাং, আমার এই অবস্থা, মরি কি বাঁচি তাহার ঠিক নাই। তোমরা পুরুষ, তোমাদের দশ দশা, আর আমাদের এই এক দশা। আমার বড়ই সাধ হইতেছে আমি একটু

পায়স খাই! আমাকে একটু পায়স খাওয়াতে পার না? তোমার কি ইচ্ছা হয় না?

ব্যাং—ইচ্ছা ত হয়, কিন্তু খাওয়াই কি করে? পায়স কোথায় পাব? পায়স কি আর সকলে সকল দিন খায় যে একটু চুরি ক'রে এ'নে দিব?

বেঙ্গী—আচ্ছা! তা না হয়, তুমি সব জিনিষপত্র যোগাড় ক'রে আন, আমি রেঁধেই খা'ব! একটু দুধ আন্তে পারবে না?

ব্যাং—কি ক'রে?

বেঙ্গী—কেন? গৃহস্থের বাড়ী যাও—গৃহস্থে গাই দোয়াইয়া হাঁড়ীতে দুধ রেখেছে, সেখান থেকে চুপ ক'রে একটু দুধ নিয়ে এস।

ব্যাং—আচ্ছা, তা' ন'য় হ'লো। কিন্তু চা'লের কি হবে?

বেঙ্গী—আরে মূর্খ, সেও যে গৃহস্থের বাড়ী পাওয়া যাবে? সে কথাওকি ব'লে দিতে হবে?

ব্যাং—আচ্ছা, সেও যেন হ'লো, কিন্তু গুড়ের কি হবে? গুড় পাব কোথায়?

বেঙ্গী—কেন? আ'জকে হাটের দিন, হাটে যাও। এক দোকান থেকে পাশ কাটীয়ে একটু গুড় নিয়ে এ'স। তা পার্ব্বে না?

ব্যাং—তা পার্ব্বো না ত কি? তোমার গুড়ের জন্য আমি হাটে যেয়ে এক জনের পায়ের নীচে পড়ে মারা যাই আর কি? কেমন নয়?

বেঙ্গী—তা' হ'লে কি হয়? তুমি মর আর বাঁচ, তা' দেখ্‌লে চল্‌বে না, পায়স আমায় খেতেই হবে।"

ব্যাং বেঙ্গীর এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং ক্রোধে অধীর হইয়া "আমি মরি তা' তোর কিছু যায় আসে না—কিন্তু তো'র পায়স খেতেই হ'বে" বলিয়া বেশ দু' চা'র ঘা মারিতে লাগিল এবং "বলিল তুই কি আমাকে ঐ বোকা মূর্খ রাজার মত মনে করিয়াছিস? ও যেমন স্ত্রীর কথায় তনু ত্যাগ করিতে চলিয়াছে"? বেঙ্গী মা'র খাইয়া তাড়াতাড়ি তখন বলিল, "না না আমার পায়সের দরকার নাই, আর আমি পায়স চাই না।" ব্যাং তখন নিরস্ত হইল ও আস্তে আস্তে ক্রোধ সম্বরণ করিল। রাজা তখন আপনার হাতে কানমলা খাইয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া বিদায় হইলেন এবং অদূরে আপন বাহিনীর নিকট যাইয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করার পর সকলকে বলিলেন, "যদি মরিতেই হয় তবে আর গঙ্গাতীরে যাইয়া কি হইবে? এখানেই মরিব। কাহারও অমত করিবার কিছু ছিল না, সকলেই তাহাতে সম্মতি দান করিল। রাজা রাণীর পাল্কী স্বীয় পাল্কীর সন্নিকটে আনিতে আদেশ করিলেন। অনতি বিলম্বে তাহার সে আদেশ প্রতিপালিত হইল। রাণীর শিবিকা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার শিবিকার সম্মুখস্থিত হইল। শিবিকা দুইখানি রাজার আদেশে একবারে মুখামুখী স্থিত হইল। এবং উভয় খানারই বাহিরের দিকের দরজা বন্ধ করা হইল। গুপ্তকথা অতি সংগোপনে ব্যক্ত করা উচিত! যা'ই হো'ক, রাজা তখন রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ রাণি, তোমার কি এই গুপ্ত

কথাটী না শুনিলেই নয়" ? রাণী পূর্ব্ববৎ উত্তর করিলেন "না।" রাজা তখন পূর্ব্বের ন্যায় বলিলেন "দেখ, বলিবা মাত্রই আমাকে মরিতে হইবে। আমার মরাই কি ভাল ? না, তোমার শুনাই ভাল ?" রাণী তদুত্তরে পূর্ব্বরূপ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "আমি গুপ্ত কথা শুনিবই।" রাজা তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া রাণীকে বেশ উত্তম মধ্যম দু' চা'র কথার বিধান করিলেন। রাণী এই বেলা পরিতুষ্টা হইয়া পরম সন্তোষের সহিত তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না—না—আমার কথা শুনিয়া কাজ নাই, চল আমরা বাড়ী যাই !" তখন তদনুরূপ ব্যবস্থা হইল। রাজা, রাণী, লোকজন সমভিব্যাহারে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন"। আ'জ কা'ল বাঙ্গালা দেশেও সেইরূপ দেখিতেছি, "মর তা'তে ক্ষতি নাই পায়স খাইতেই হইবে।" এ কি ভীষণ নয় ? বঙ্গ-ললনাদের এ অন্যায় আব্‌দার, এ অন্যায় ব্যবস্থা, এ অযৌক্তিক রীতি নীতি, এ সব কি ত্যাগ করা উচিত নয় ? বঙ্গ মহিলারা এ সব ভুলিয়া গেলে কি সমাজ এবং বঙ্গসংসারের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল হইতে পারে না ? আর তাঁহারা কি এরূপ করিতে পারেন না ? এ বাহিরের বিদেশী হাওয়া ত্যাগ করিয়া স্বদেশীভাবে অনুপ্রাণিতা হইয়া উচ্চশিক্ষায় এবং সৎশিক্ষায় জ্ঞানলাভ করিয়া বঙ্গভবনকে পুনরায় কি সুখময় শান্তি নিকেতনে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন না ? যদি তাহা করেন, তাহা হইলেই ত সকল দুঃখের অবসান হয়। বঙ্গগৃহ—বঙ্গসংসার আবার সুখের আগারে পরিণত হয়! তাহারা সৎশিক্ষায় সুশোভিতা হ'ন, সদ্‌জ্ঞানে বিভূষিতা হ'ন, পতিপরায়ণা হ'ন, সংসারের কর্ত্তব্য পালনে প্রস্তুত হউন,

দেখিতে পাইবেন তাহারাও স্বাধীনা, সংসার তাহাদের সুখের, স্বামীই তাঁহাদের অধীন। মাতৃগণ, একবার ও বিদেশীরূপ পরিবর্জ্জন কর, স্বদেশের সাজে সজ্জিতা হও, স্বদেশের ভাবে অনুপ্রাণিতা হও, আপনার প্রতি দৃষ্টি কর, সৎশিক্ষায় শিক্ষিতা হও, সুন্দর জ্ঞানে সুশোভিতা হও, আত্মদর্শন কর, দেখিবে—কেউ তোমার স্বাধীনতা হরণ করে নাই, কে'উ তোমাকে পরাধীন করে নাই। একবার সেই মূর্ত্তিধারণ কর, তোমার স্বভাব ফিরিয়া আসুক, একবার তুমি আবার আপনা ভুলিয়া সন্তানগণকে শিক্ষা দাও, আবার বাংলায়, বঙ্গগৃহে, বঙ্গসংসারে, শান্তি সুখ ফিরিয়া আসুক—বাঙ্গালী কর্ত্তব্য পালনে প্রস্তুত হউক, বাঙ্গালী মানুষ হউক, আবার বাংলার সুনীল আকাশতলে বাঙ্গালীর যশধ্বজা উড্ডীয়মান হউক।